প্রবন্ধ

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

2021

সূচিপত্র

- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ০১ ... 3
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ০২ ... 5
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ০৩ ... 7
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ০৪ ... 11
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ০৫ ... 15
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ০৬ ... 17
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ০৭ ... 18
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ০৮ ... 20
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ০৯ ... 21
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ১০ ... 27
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ১১ ... 28
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ১২ ... 31
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ১৩ ... 34
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ১৪ ... 37
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ১৫ ... 38
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ১৬ ... 39
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ১৭ ... 40
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ১৮ ... 42
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ১৯ ... 45
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ২০ ... 47

- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ২১ 49
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ২২ 50
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ২৩ 54
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ২৪ 56
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ২৫ 58
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ২৬ 59
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ২৭ 62
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ২৮ 64
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ২৯ 66
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ৩০ 67
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ৩১ 68
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ৩২ 69
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ৩৩ 70
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ৩৪ 71
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ৩৫ 72
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ৩৬ 73
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ৩৭ 74
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ৩৮ 75
- সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা - ৩৯ 77

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ০১

এবারকার ভারতীতে লজ্জাবতী নামক একটি গল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এ রচনাটি ছোটো গল্পলেখার আদর্শ বলিলেই হয়। দুটি-একটি বাঙালি অন্তঃপুরবাসিনীর জাজ্বল্যমান ছবি আঁকা হইয়াছে অথচ তাহাকে কোনোপ্রকার কাল্পনিক ভঙ্গি করিয়া বসানো হয় নাই, যেমনটি তেমনি উঠিয়াছে। কোনো বাড়াবাড়ি নাই,রকম-সকম নাই,রোমহর্ষণ ভাষাপ্রয়োগ নাই,অথচ পাঠসমাপ্তি কালে পাঠকের চোখে অতি সহজে অশ্রুবিন্দু সঞ্চিত হইয়া আসে। “বিলাপ’ একটি গদ্যপ্রবন্ধ। কিন্তু ইহাতে না আছে গদ্যের সংযম, না আছে পদ্যের ছন্দ। আজকাল এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল অমূলক প্রবন্ধ বাংলা ভাষায় প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন লেখার কোনো আবশ্যক দেখি না।–লিটারেরি। ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রতিধ্বনি থাকে তেমনি সকল দলেরই পশ্চাতে কতকগুলি অনুবর্তী লোক থাকে তাহারা খাঁটি দলভুক্ত নহে অথচ ভাবভঙ্গির অনুকরণ করিয়া দলপতির সঙ্গে একত্রে তরিয়া যাইতে চাহে। এরূপ লোক সর্বত্রই উপহাস্যাস্পদ হইয়া থাকে। সেইরূপ যাঁহারা সারস্বতমণ্ডলীর ছায়াস্বরূপে থাকিয়া সাহিত্যের ভড়ং করিয়া থাকেন লেখক তাঁহাদিগকে লিটারেরি নাম দিয়া কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বাংলা দেশে সেরূপ মণ্ডলীও নাই এবং তাঁহাদের ফিকা অনুকরণও নাই। লেখক যে বর্ণনা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বাংলা দেশের কোনো বিশেষ দলের প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। লেখা পড়িয়াই মনে হয় সাহিত্য সম্বন্ধে কাহারও সহিত লেখকের তর্ক হইয়া থাকিবে,এবং প্রতিপক্ষের নিকট হইতে এমন কোনো রূঢ় উত্তর শুনিয়া থাকিবেন যে,”ও- সকল তুমি বুঝিবে কী করিয়া!” সেই ক্ষোভে তাঁহার প্রতিপক্ষের একটি বিরূপ প্রতিমূর্তি আঁকিয়া অমনি কাগজে ছাপাইয়া বসিয়াছেন। লেখকের বিবেচনায় তাঁহার এ রচনা যতই তীব্র এবং অসামান্য ব্যঙ্গরসপূর্ণ হৌক-না-কেন ইহা ছাপায় প্রকাশ করিবার যোগ্য নয়। এরূপ লেখা সত্যও নহে, সুন্দরও নহে,এবং ইহাতে কাহারও কোনো উপকার দেখি না। –প্ল্যাঞ্চেট। আদি ব্রাহ্মসমাজের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র

বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত নামে যে পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। প্ল্যাঞ্চেটে বিদ্যারত্ন মহাশয় এবং একটি বালকের সহযোগে যে দুইটি ইংরাজি কবিতা বাহির হইয়াছে তাহা অতিশয় বিস্ময়জনক। বিশেষত শেষ কবিতাটি কোনো বাঙালির নিকট হইতে আশা করা যায় না। –“একাল ও ওকালের মেয়ে’ যে লেখিকার রচনা আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ দিই। এরূপ সরল পরিষ্কার যুক্তিপূর্ণ এবং চিত্রিতবৎ লেখা কয়জন লেখক লিখিতে পারেন? লেখিকা কালের পরিবর্তন সম্বন্ধে যে গুটিকতক কথা বলিয়াছেন তাহা অতিশয় সারগর্ভ। যে লোক ট্রামে চড়িতেছে; পূর্বে যাহারা ঠন্ঠনের চটিও পরিত না আজ তাহারা বিলাতি জুতা-মোজা পরিতেছে; জীবনযাত্রা সম্বন্ধে পুরুষসমাজে যে আশ্চর্য পরিবর্তন প্রচলিত হইয়াছে তাহা কয়জন পূর্বের সহিত তুলনা করিয়া দেখেন? কিন্তু আমাদের স্ত্রীলোকদের মধ্যে বর্তমান কালোচিত পরিবর্তনের লেশমাত্র দেখিলেই এই নূতন ভাবের ভাবুক, এই নূতন বিদ্যালয়ের ছাত্র এই নূতন পরিচ্ছদ-পরিহিত নববিলাসী পরিহাস করেন,প্রহসন লেখেন এবং কেহ কেহ সীতা দময়ন্তীকে স্মরন করিয়া প্রকাশ্যে অশ্রু বিসর্জন করিয়া থাকেন। তাঁহারা আশা করেন সমাজের পুরুষার্ধ শিক্ষাকিরণে পাকিয়া রাঙা হইয়া উঠিবে এবং বাকি অর্ধেক সনাতন কচিভাব রক্ষা করিবে। এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না, এক ফলে পৃথক নিয়ম খাটে না। অতএব ভালোই বল আর মন্দই বল পুরুষের অনুগামিনী হওয়া স্ত্রীলোকের প্রাচীন ধর্ম– বর্তমান সহস্র নূতনত্বের মধ্যে সেই প্রাচীন মনু-কথিত ধর্ম অব্যাহত থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। লেখিকা বর্তমান আতিথ্য সম্বন্ধে যে দু-এক কথা লিখিয়াছেন তাহার মধ্যে অনেক ভাবিবার বিষয় আছে।

ভারতী। ১৫শ ভাগ। আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ০২

“চৈতন্যচরিত ও চৈতন্যধর্ম’; বহুকাল হইতে এই প্রবন্ধ নব্যভারতে প্রকাশিত হইতেছে। চৈতন্যের জীবনচরিত ও ধর্ম সম্বন্ধে লেখক একটি কথাও বাকি রাখিতেছেন না। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বিচার দ্বারা সত্য মিথ্যা নির্বাচন করিয়া গেলে ভালো হইত। যাহা হৌক, লেখকের পরিশ্রম এবং বিপুল সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিতে হয় এবং সেইসঙ্গে সম্পাদককে বলিতে হয় এরূপ বিস্তারিত গ্রন্থ সাময়িক পত্রে প্রকাশের যোগ্য নহে। “সাঁওতালের বিবাহ প্রণালী” প্রবন্ধটি বিশেষ কৌতুকজনক। “মহা তীর্থযাত্রা” লেখকের নরোয়ে ভ্রমন বৃত্তান্ত। বর্ণনাংশ বড়ো বেশি সংক্ষিপ্ত এবং লেখকের হৃদয়াবেগ অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল। শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয় “শকাব্দ” প্রবন্ধে শকাব্দ প্রবর্তনের ইতিহাস সমালোচনা করিয়াছেন। সাধারণের বিশ্বাস, এই অব্দ বিক্রমাদিত্য-কর্তৃক প্রচলিত। লেখক প্রমাণ করিতেছেন যে, এক সময়ে মধ্য এশিয়াবাসী শক জাতি (ইংরাজিতে যাহাদিগকে সাইথিয়ান্‌স্‌ বলে) ভারতে রাজ্য স্থাপন করিয়া এই অব্দ প্রচলিত করে। লেখক প্রাচীন গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কার করিয়াছেন। রচনাটি অতিশয় প্রাঞ্জল হইয়াছে। সাধারণত বাংলা সাময়িক পত্রে পুরাতত্ত্ব প্রবন্ধগুলি অসংখ্য তর্কজালে জড়িত হইয়া পাঠকসাধারণের পক্ষে যেরূপ একান্ত দুর্গম ও ভীতিজনক হইয়া উঠে এ লেখাটিকে সে অপবাদ দেওয়া যায় না– আশ্চর্য এই যে প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সুসংলগ্ন সংক্ষিপ্ত এবং বোধগম্য। “আত্মসম্ভ্রম” প্রবন্ধ হইতে আমরা দুই-এক জায়গা উদ্‌ধৃত করি। বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে লেখক লিখিতেছেন,”তুমি যাহার কাপড় পরিয়া আরাম পাও,যাহার হার্মোনিয়ম বাজাইয়া পুলকিত হও,যাহার রেলগাড়ি ও টেলিগ্রাফ দেখিয়া চমকিয়া যাও,যাহার পমেটাম ল্যাভেন্ডার মাথায় দিয়া কৃতার্থ মনে কর, যাহার ফেটিঙে চড়িয়া স্বর্গসুখ লাভ কর, যাহার জাহাজ কামান তোমার দেবকীর্তি বোধ হয় তাহার সহিত তোমার কোনো সম্বন্ধ থাকুক বা না থাকুক,তাহার গোলাম তোমাকে হইতেই হইবে।... ইংরাজের শিল্প সম্বন্ধে আমার এ বিশ্বাস অটল যে, তাহার এ দেশের

অর্ধেক আধিপত্য রেল ও স্টিমার হইতে হইয়াছে; কারণ, সাধারণে এইগুলি সর্বদা দেখিয়া থাকে ও বিস্ময়জনক মনে করে, সুতরাং ইহাতেই নিজের নিজের বল,সাহস ও অভিমান হারায়।”

নব্যভারত। আশ্বিন ও কার্তিক [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ০৩

এই সংখ্যায় “ফুলদানী’ নামক একটি ছোটো উপন্যাস ফরাসীস্ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ লেখক প্রস্পর মেরিমে -প্রণীত এই গল্পটি যদিও সুন্দর কিন্তু ইহা বাংলা অনুবাদের যোগ্য নহে। বর্ণিত ঘটনা এবং পাত্রগণ বড়ো বেশি য়ুরোপীয়- ইহাতে বাঙালি পাঠকদের রসাস্বাদনের বড়োই ব্যাঘাত করিবে। এমন-কি, সামাজিক প্রথার পার্থক্যহেতু মূল ঘটনাটি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ মন্দই বোধ হইতে পারে। বিশেষত মূল গ্রন্থের ভাষা-মাধুর্য অনুবাদে কখনোই রক্ষিত হইতে পারে না, সুতরাং রচনার আব্রুটুকু চলিয়া যায়। “শিক্ষিতা নারী” প্রবন্ধে শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী বিস্তর গবেষণা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় নারীদের অর্থোপার্জনশক্তির দৃষ্টান্তস্বরূপে মার্কিন স্ত্রী-ডাক্তার স্ত্রী-অ্যাটর্নি এবং ইংরাজ স্ত্রী-গ্রন্থকারদিগের আয়ের আলোচনা করা নিষ্ফল। বড়ো বড়ো ধনের অঙ্ক দেখাইয়া আমাদিগকে মিথ্যা প্রলোভিত করা হয় মাত্র। জর্জ এলিয়ট তাঁহার প্রথম গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া লক্ষ টাকা মূল্য পাইয়াছিলেন। যদি নাও পাইতেন তাহাতে তাঁহার গৌরবের হানি হইত না। এমন দৃষ্টান্ত শুনা গিয়াছে অনেক পুরুষ গ্রন্থকার তাঁহাদের জগদ্‌বিখ্যাত গ্রন্থ নিতান্ত যৎসামান্য মূল্যে বিক্রয় করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই, পুরুষের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জন স্ত্রীলোকের কার্য নহে। যদি দুর্ভাগ্যক্রমে কোনো স্ত্রীলোককে বাধ্য হইয়া স্বয়ং উপার্জনে প্রবৃত্ত হইতে হয় তবে তাঁহাকে দোষ দেওয়া বা বাধা দেওয়া উচিত হয় না স্বীকার করি- “কিন্তু সংসার রক্ষা করিতে হইলে সাধারণ স্ত্রীলোককে স্ত্রী এবং জননী হইতেই হইবে। সর্বদেশে এবং সর্বকালেই স্ত্রীলোক যে পুরুষের সমান শিক্ষা লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন অবশ্যই তাহার একটা প্রাকৃতিক কারণ আছে। মানুষের প্রথম শিক্ষা বিদ্যালয়ে নহে, বহির্জগতে, কর্মক্ষেত্রে। গর্ভধারণ এবং সন্তানপালনে অবশ্য নিযুক্ত হইয়া স্ত্রীলোক চিরকাল এবং সর্বত্র সেই শিক্ষায় বহুল পরিমাণে বঞ্চিত হইয়াছে। তাহা ছাড়া এই জননীকর্তব্যের উপযোগী হইবার অনুরোধে তাঁহাদের শারীরিক প্রকৃতিও ভিন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই ভিন্নতাই যে স্ত্রী-পুরুষের বর্তমান

অবস্থাপার্থক্যের মূল প্রাকৃতিক কারণ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যাহা হউক, এক্ষণে সভ্য সমাজের অবস্থা অনেক পরিমাণে নূতন আকার ধারণ করিয়াছে। প্রথমত, এককালে মানুষকে যাহা দায়ে পড়িয়া প্রকৃতির সহিত সংগ্রাম করিয়া শিক্ষা করিতে হইত, এখন তাহার অধিকাংশ বিনা বিপদ ও চেষ্টায় বিদ্যালয়ে পাওয়া যায়। দ্বিতীয়ত , অবিশ্রাম যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি নিবারিত হইয়া স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ক্রমশ প্রকৃতির সামঞ্জস্য হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সভ্যতার একটি লক্ষণ এই, উত্তরোত্তর কর্তব্যের ভাগ। কুঁড়ি যত ফুটিতে থাকে তাহার প্রত্যেক দল ততই স্বতন্ত্র হইয়া আসে। সভ্যতার উন্নতি অনুসারে স্ত্রীলোকের কর্তব্যও বাড়িয়া উঠিয়া তাহাকে পুরুষ হইতে পৃথক করিতে থাকিবে। অনেক পশু জন্মদান করিয়াই জননীকর্তব্য হইতে অব্যাহতি পায়। কিন্তু মনুষ্যমাতা বহুকাল সন্তানভার ত্যাগ করিতে পারেন না। অসভ্য অবস্থায় সন্তানের প্রতি মাতার কর্তব্য অপেক্ষাকৃত লঘু ও ক্ষণস্থায়ী। যত সভ্যতা বাড়িতে থাকে, যতই মানুষের সম্পূর্ণতা পরিস্ফুট হইতে থাকে, ততই “মানুষ করা” কাজটা গুরুতর হইয়া উঠে। প্রথমে যাহা বিনা শিক্ষায় সম্পন্ন হইতে পারিত, এখন তাহাতে বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক করে। অতএব মানুষ যতই উন্নত হইয়া উঠিতে থাকে মাতার কর্তব্য ততই গৌরবজনক এবং শিক্ষাসাধ্য হইয়া উঠে। তাহার পর, যিনি জননী হইয়াছেন, জননীর স্নেহ, জননীর সেবাপরায়ণতা, জননীর শিক্ষা বিশেষ করিয়া লাভ করিয়াছেন তিনি কি সন্তান যোগ্য হইবামাত্র সেগুলি বাক্সয় তুলিয়া রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তাঁহার সেই-সমস্ত শিক্ষা তাঁহার সেই-সমস্ত কোমল প্রবৃত্তির নিয়ত চর্চা ব্যতীত তিনি কি চরিতার্থতা লাভ করিতে পারেন? এইজন্য তিনি স্বতই তাঁহার স্বামী ও পরিবারের জননীপদ গ্রহণ করেন– ইহা তাঁহার জীবনের স্বাভাবিক গতি। এবং তাঁহার কন্যাও সেই জননীর গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং নিঃসন্তান হইলেও হৃদয়ের গুণে তাঁহার সন্তানের অভাব থাকে না। প্রকৃতিই রমণীকে বিশেষ কার্যভার ও তদনুরূপ প্রবৃত্তি দিয়া গৃহবাসিনী করিয়াছেন, পুরুষের সার্বভৌমিক স্বার্থপরতা ও উৎপীড়ন নহে– অতএব বাহিরের কর্ম দিলে তিনি সুখীও হইবেন না, সফলও হইবেন না। দেনা-পাওনা, কেনাবেচা নিষ্ঠুর কাজ। সে কাজে যাহারা কৃতকার্যতা লাভ করিতে চাহে তাহারা কেহ কাহাকেও রেয়াত করে না। পরস্পরকে নানা উপায়ে অতিক্রম করিয়া নিজের

স্বার্থটুকুকে রক্ষা করা ব্যবসা, বিজ্‌নেস্‌। এইজন্য কার্যক্ষেত্রে সহৃদয়তা অধিকাংশ স্থলে হাস্যাস্পদ এবং বেশিদিন টিকিতেও পারে না। যিনি প্রকৃতির নির্দেশানুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষা লাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য। অতএব আমেরিকায় যে দোকানদারি আরম্ভ হইয়াছে সে কথা না উত্থাপন করাই ভালো, তাহার ফলাফল এখনো পরীক্ষা হয় নাই। তবে এ কথা সহস্রবার করিয়া বলিতে হইবে, মানুষকে “মানুষ করিয়া’ তুলিতে শিক্ষার আবশ্যক। সেও যে কেবল সামান্য ছিটেফোঁটা মাত্র তাহা নহে, রীতিমতো শিক্ষা। অবশ্য মানুষকে কেরানি করিয়া তুলিতে বেশি শিক্ষা চাই না, স্তনদানের পালা সাঙ্গ করিয়া পাঠশালায় ছাড়িয়া দিলেই চলে; দোকানদার করিতে হইলেও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু আমরা সচরাচর মনে করি মানুষ হইয়া তেমন লাভ নাই ,সুদে পোষায় না, যেমন-তেমন করিয়া আপিসে প্রবেশ করিতে পারিলেই জীবনের কৃতার্থতা; অতএব মেয়েদের শিক্ষা দিবার আবশ্যক নাই, তাহারা স্তনদান এবং রান্না-বাড়্‌না করুক, আমরা সে কাজগুলাকে আধ্যাত্মিক আখ্যা দিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিব এবং শিক্ষা স্বাস্থ্য ও সুখ সম্মানের পরিবর্তে দেবী উপাধি দিয়া তাহাদিগকে বিনামূল্যে ক্রয় করিয়া রাখিব।

কার্তিক। [১২৯৮] কার্তিক মাসের সাহিত্যে “হিন্দুজাতির রসায়ন” একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রাচীন রাসায়নিক যন্ত্রের বর্ণনা প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংখ্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আত্মজীবনচরিতের কয়েক পৃষ্ঠা বাহির হইয়াছে। ইহাতে অলংকারবাহুল্য বা আড়ম্বরের লেশমাত্র নাই। পূজনীয় লেখকমহাশয় সমগ্র গ্রন্থটি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই বলিয়া মনে একান্ত আক্ষেপ জন্মে। এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইলে বাঙালিদের পক্ষে শিক্ষার স্থল হইত। প্রথমত, একটি অকৃত্রিম মহত্ত্বের আদর্শ বঙ্গসাহিত্যে চিরজীবন লাভ করিয়া বিরাজ করিত, দ্বিতীয়ত, আপনার কথা কেমন করিয়া লিখিতে হয় বাঙালি তাহা শিখিতে পারিত। সাধারণত বাঙালি লেখকেরা নিজের জবানী কোনো কথা লিখিতে গেলে অতিশয় সহৃদয়তা প্রকাশ করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া থাকেন– হায় হায় মরি মরি শব্দে পদে পদে হৃদয়াবেগ ও অশ্রুজল উদ্‌বেলিত করিয়া তোলেন। “আত্মজীবনচরিত’ যতটুকু বাহির হইয়াছে তাহার মধ্যে একটি সংযত

সহৃদয়তা এবং নিরলংকার সত্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছে। স্ত্রীজাতির প্রতি লেখকমহাশয় যে ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন তাহা কেমন সরল সমূলক ও অকৃত্রিম। আজকাল যাঁহারা স্ত্রীজাতির প্রতি আধ্যাত্মিক দেবত্ব আরোপ করিয়া বাক্‌চাতুরি প্রকাশ করিয়া থাকেন তাঁহাদের সহিত কী প্রভেদ!

সাহিত্য। দ্বিতীয় ভাগ। আশ্বিন। [১২৯৮]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ০৪

“হিন্দুধর্মের আন্দোলন ও সংস্কার” নামক প্রবন্ধে লেখক প্রথমে বাংলার শিক্ষিত সমাজে হিন্দুধর্মের নূতন আন্দোলনের ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পর দেখাইয়াছেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় পুরাতন হিন্দুপ্রথা সম্পূর্ণভাবে পুনঃপ্রচলিত হওয়া অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলেন “ভিন্ন দেশজাত দ্রব্যমাত্রই হিন্দুদের ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। কিন্তু বিলাতি আলু, কপি, কাবুলি মেওয়া প্রভৃতিও এখন বিলক্ষণ প্রচলিত হইয়াছে।’ “সোডা লিমনেড্‌ বরফ প্রভৃতি প্রকাশ্যরূপে হিন্দুসমাজে প্রচলিত। এ-সমস্ত যে স্পষ্ট যবন ও ম্লেচ্ছদের হাতের জল।’ তিনি বলেন, শাস্ত্রে পলাণ্ডুভক্ষণ নিষেধ কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ হইতে ইতর জাতি পর্যন্ত সকলেই পলাণ্ডু ভক্ষণ করিয়া থাকে। “যবনকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, কিন্তু বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষের অপর অংশের হিন্দুগণ মুসলমানদের সহিত একত্রে বসিয়া তাম্বুল ভক্ষণ করেন।’ “যজ্ঞ-উপবীত হইবার পর আমাদিগকে অন্যূন বারো বৎসর গুরুগৃহে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য অবলম্বনকরত শাস্ত্র আলোচনা এবং গুরুর নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিতে হয়। পরে গুরুর অনুমতি লইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। কিন্তু বর্তমান সময়ে এ পদ্ধতি অনুসারে কে কার্য করিয়া থাকে?’ “ব্রাহ্মণের ত্রিসন্ধ্যা করিতে হয় কিন্তু বর্তমান সময়ে যাঁহারা চাকুরি করেন তাঁহারা কী প্রকারে মধ্যাহ্নসন্ধ্যা সমাধা করিতে পারেন?’ লেখক বলেন, যাঁহারা অনাচারী হিন্দুদিগকে শাসন করিবার জন্য সমুৎসুক তাঁহাদিগকেই হিঁদুয়ানি লঙ্ঘন করিতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপে দেখাইয়াছেন, বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে নানাপ্রকার শাস্ত্রীয় গ্রন্থ প্রকাশ হইতেছে; ইহাতে করিয়া শাস্ত্রীয় বাক্য বেদবাক্যসকল স্ত্রী, শূদ্র, বলিতে কি, যবন ও ম্লেচ্ছদের গোচর হইতেছে। অধিক কী, বৈদিক সন্ধ্যাও তাঁহাদের কর্তৃক পরিচালিত পত্রিকায় প্রকাশিত ও ব্যাখ্যাত হইতেছে। অতঃপর লেখক বহুতর শাস্ত্রবচন উদ্‌ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন প্রাচীনকালেই বা ব্রাহ্মণের কীরূপ লক্ষণ ছিল এবং বর্তমানকালে তাহার কত পরিবর্তন হইয়াছে। এই প্রবন্ধের মধ্যে অনেক শিক্ষা ও চিন্তার

বিষয় আছে। কেবল একটা কথা আমাদের নূতন ঠেকিল। বঙ্কিমবাবু যে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ও শশধর তর্কচূড়ামণির ধুয়া ধরিয়া হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী হইয়াছেন এ কথা মুহূর্তকালের জন্যও প্রণিধানযোগ্য নহে। “ঋষি চিত্র” একটি কবিতা। লেখক শ্রীযুক্ত মধুসূদন রাও। নাম শুনিয়া কবিকে মহারাষ্ট্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু বঙ্গভাষায় এরূপ কবিত্ব প্রকাশ আর-কোনো বিদেশীর দ্বারায় সাধিত হয় নাই। কবির রচনার মধ্যে প্রাচীন ভারতের একটি শিশির-স্নাত পবিত্র নবীন উষালোক অতি নির্মল উজ্জ্বল এবং মহৎভাবে দীপ্তি পাইয়াছে। এই কবিতার মধ্যে আমরা একটি নূতন রসাস্বাদন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে বংলার অধিকাংশ লেখক যাহা লেখেন তাহার মধ্যে প্রাচীনত্বের প্রকৃত আস্বাদ পাওয়া যায় না; কিন্তু ঋষিচিত্র কবিতার মধ্যে একটি প্রাচীন গম্ভীর ধ্রুপদের সুর বাজিতেছে। নব্যভারতে শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্তের “হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিবৃত্ত’ খণ্ডশ বাহির হইতেছে। রমেশবাবু যে এতটা শ্রম স্বীকার করিয়াছেন দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম, কারণ, আমাদের দেশের বুদ্ধিমানগণ প্রাচীন হিন্দুসমাজ ঘরে বসিয়া গড়িয়া থাকেন। সে সমাজে কী ছিল কী না ছিল, কোন্‌টা হিন্দু কোন্‌টা অহিন্দু সেটা যেন বিধাতাপুরুষ সূতিকাগৃহে তাঁহাদের মস্তিষ্কের মধ্যে লিখিয়া দিয়াছেন, তাহার অন্য কোনো ইতিহাস নাই। ঐতিহাসিক প্রণালী অনুসরণ করিয়া রমেশবাবু এই যে প্রাচীন সমাজচিত্র প্রকাশ করিতেছেন ইহার সহিত আমাদের বাংলার আজন্ম-পণ্ডিতগণের মস্তিষ্ক-লিখনের ঐক্য হইবে এরূপ আশা করা যায় না। নিজের শখ অনুসারে তাহারা প্রত্যেকেই দুটি-চারিটি মনের মতো শ্লোক সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন, ইতিহাস বিজ্ঞানকে তাহার কাছে ঘেঁসিতে দেন না। মনে করো তাহার কোনো-একটি শ্লোকে ঋষি বলিতেছেন রাত্রি, আমরা দেখিতেছি দিন। বঙ্গপণ্ডিত তৎক্ষণাৎ তাহার মীমাংসা করিয়া দিবেন “আচ্ছা চোখ বুজিয়া দেখো দিন কি রাত্রি।’ অমনি বিংশতি সহস্র চেলা চোখ বুজিবেন এবং মস্তক আন্দোলন করিয়া বলিবেন “অহো কী আশ্চর্য! ঋষিবাক্যের কী মহিমা! গুরুদেবের কী তত্ত্বজ্ঞান! দিবালোকের লেশমাত্র দেখিতেছি না’। যে হতভাগ্য চোখ খুলিয়া থাকিবে, যদি তাহার চোখ বন্ধ করিতে অক্ষম হন তো ধোপা নাপিত বন্ধ করিবেন, এবং দুই-একজন মহাপ্রাজ্ঞ সৃষ্টিছাড়া তত্ত্ব উদ্‌ভাবন করিয়া তাহার চোখে ধুলা দিতে ছাড়িবেন না। দুঃখের বিষয়,

বাঙালির এই স্বরচিত ভারতবর্ষ, সত্য হৌক, মিথ্যা হৌক খুব যে উচ্চশ্রেণীর ভারতবর্ষ তাহা নহে। বাংলাদেশের একখানি গ্রামকে অনেকখানি “আধ্যাত্মিক” গঙ্গাজলের সহিত মিশাল করিয়া একটি বৃহৎ ভারতবর্ষ রচনা করা হয়; সেখানেও কয়েকজন নিস্তেজ নির্বীয মানুষ অদৃষ্টের কর-ধৃত নাসারজ্জু অনুসরণ করিয়া সাতিশয় কৃশ ও পবিত্রভাবে ধীরে ধীরে চলিতেছে; সমাজ অর্থে জাতি লইয়া দলাদলি, ধর্ম অর্থে সর্ববিষয়েই স্বাধীন বুদ্ধিকে বলিদান, কর্ম অর্থে কেবল ব্রতপালন এবং ব্রাহ্মণভোজন, বিদ্যা অর্থে পুরাণ মুখস্ত, এবং বুদ্ধি অর্থে সংহিতার শ্লোক লইয়া আবশ্যক অনুসারে ব্যাকরণের ইন্দ্রজাল দ্বারা আজ “না’-কে হাঁ করা কাল “হাঁ’-কে না করার ক্ষমতা। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে বঙ্গসমাজ প্রাচীন হিন্দুসমাজের ন্যায় উন্নত ও সজীব নহে, অতএব বাঙালির কল্পনার দ্বারা প্রাচীন ভারতের প্রতিমূর্তি নির্মাণ অসম্ভব– প্রকৃষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রীতিমতো ইতিহাসের সাহায্য ব্যতীত আর গতি নাই। একজন চাষা বলিয়াছিল, আমি যদি রানী রাসমণি হইতাম তবে দক্ষিণে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, বামে একটা চিনির হাঁড়ি রাখিতাম, একবার ডান দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া খাইতাম একবার বাম দিক হইতে একমুষ্টি লইয়া মুখে পুরিতাম। বলা বাহুল্য, চিনির প্রাচুর্যে রানী রাসমণির এতাধিক সন্তোষ ছিল না। রমেশবাবুও প্রমাণ পাইয়াছেন প্রাচীন ভারতে ব্রহ্মণ্য ও সাত্ত্বিকতারই সর্বগ্রাসী প্রাদুর্ভাব ছিল না; মৃত্যুর যেরূপ একটা ভয়ানক নিশ্চল ভাব আছে তখনকার সমাজনিয়মের মধ্যে সেরূপ একটা অবিচল শ্বাসরোধী চাপ ছিল না, তখন বর্ণভেদ প্রথার মধ্যেও সজীব স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু চিনিকেই যে লোক সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছে, তাহাকে রানী রাসমণির আহারের বৈচিত্র্য কে বুঝাইতে পারিবে?– দুর্ভাগ্যক্রমে একটি মত বহুকাল হইতে প্রচারিত হইয়াছে যে, হিন্দুসমাজের পরিবর্তন হয় নাই। সেই কথা লইয়া আমরা গর্ব করিয়া থাকি যে আমাদের সমাজ এমনি সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল যে সহস্র বৎসরে তাহার এক তিল পরিবর্তন সাধন করিতে পারে নাই। জগতের কোথাও কিছুই থামিয়া নাই, হয় সংস্কার নয় বিকারের দিকে যাইতেছে; যখন গঠন বন্ধ হয় তখনই ভাঙন আরম্ভ হয় জীবনের এই নিয়ম। জগতের মধ্যে কেবল হিন্দুসমাজ থামিয়া আছে। হিন্দুসমাজের শ্রেষ্ঠতার পক্ষে সেই একটি প্রধান যুক্তি, এ সমাজ সাধারণ জগতের নিয়মে

চলে না, এই ঋষি-রচিত সমাজ বিশ্বামিত্র-রচিত জগতের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া। কিন্তু ইঁহারা এক মুখে দুই কথা বলিয়া থাকেন। একবার বলেন হিন্দুসমাজ নির্বিকার নিশ্চল, আবার সময়ান্তরে পতিত ভারতের জন্য বর্তমান অনাচারের জন্য কণ্ঠ ছাড়িয়া বিলাপ করিতে থাকেন। কিন্তু পতিত ভারত বলিতে কি প্রাচীন ভারতবর্ষের বিকার বুঝায় না? সেই হিন্দুধর্ম সেই হিন্দুসমাজ সবই যদি ঠিক থাকে তবে আমরা নূতনতর জীব কোথা হইতে আসিলাম? “য়ুরোপীয় মহাদেশ’ লেখাটি সন্তোষজনক নহে। কতকগুলা নোট এবং ইংরাজী, বাংলা, ফরাসি (ভুল বানানসমেত) একত্র মিশাইয়া সমস্ত ব্যাপারটা অত্যন্ত অপরিষ্কার এবং অসংলগ্ন হইয়াছে। বাংলা লেখার মধ্যে অনেকখানি করিয়া ইংরাজি এই পত্রে অন্যান্য প্রবন্ধেও দেখা যায় এবং সকল সময়ে তাহার অত্যাবশ্যকতা বুঝা যায় না। “বঙ্গবাসীর মৃত্যু’ প্রবন্ধে লেখক বড়ো বেশি হাঁসফাঁস করিয়াছেন; লেখক যত সংযত ভাবে লিখিতেন লেখার বল তত বৃদ্ধি পাইত। হৃদয়ের উত্তাপ অতিমাত্রায় রচনার মধ্যে প্রয়োগ করিলে অনেক সময়ে তাহা বাষ্পের মতো লঘু হইয়া যায়।

সাধনা, অগ্রহায়ণ, ১২৯৮। নব্যভারত, অগ্রহায়ণ, ১২৯৮

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ০৫

বর্তমান-সংখ্যক সাহিত্যে “আহার’ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তাহার বিস্তারিত সমালোচনা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল। “প্রাকৃতিক নির্বাচনে’ চন্দ্রশেখরবাবু ডারুয়িনের মতের কিয়দংশ সংক্ষেপে সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। “মুক্তি” একটি ছোটো গল্প। কতকটা রূপকের মতো। কিন্তু আমরা ইহার উপদেশ সম্যক্‌ গ্রহণ করিতে পারিলাম না। মুক্তি যে সংসারের বাহিরে হিমালয়ের শিখরের উপরে প্রাপ্তব্য তাহা সংগত বোধ হয় না। মুক্তি অর্থে আত্মার স্বাধীনতা, কিন্তু স্বাধীনতা অর্থে শূন্যতা নহে। অধিকার যত বিস্তৃত হয় আত্মার ক্ষেত্র ততই ব্যাপ্ত হয়। সেই অধিকার বিস্তারের উপায় প্রেম। প্রেমের বিষয়কে বিনাশ করিয়া মুক্তি নহে, প্রেমের বিষয়কে ব্যাপ্ত করিয়াই মুক্তি। বৈষয়িক স্বার্থপরতায় আমরা সমস্ত সুখ সম্পদ কেবল নিজের জন্য সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করি– কিন্তু সুখকে অনেকের মধ্যে বিভাগ করিয়া না দিলে সুখের প্রসারতা হয় না– এইজন্য কৃপণ প্রেমের বৃহত্তর সুখ হইতে বঞ্চিত হয়। আত্মসুখে বিশ্বসুখকে বাদ দিলে আত্মসুখ অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়ে। তেমনি আধ্যাত্মিক স্বার্থপরতায় আমরা আপনার আত্মাটি কক্ষে লইয়া অনন্ত বিশ্বকে লঙ্ঘন করিয়া একাকী মুক্তিশিখরের উপরে চড়িয়া বসিতে চাহি। কিন্তু প্রেমের মুক্তি সেরূপ নহে– যে বিশ্বকে ত্যাগ করেন নাই, সে বিশ্বকে সেও ত্যাগ করে না। যে দিন নিখিলকে আপনার ও আপনাকে নিখিলের করিতে পারিবে সেই দিনই তাহার মুক্তি। কিন্তু তাহার পূর্বে অসংখ্য সোপান আছে তাহার কোনোটিকে অবহেলা করিবার নহে। অধিকারের স্বাধীনতা এবং অধিকারহীনতার স্বাধীনতায় আকাশপাতাল প্রভেদ। –চীন পরিব্রাজক হিউএন সঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় “প্রাচীন ভারতবর্ষ’ নামে খৃ। সপ্তম শতাব্দীর ভারতবর্ষের একটি চিত্র প্রকাশ করিতেছেন। নাম লইয়া তারিখ লইয়া কেবল তর্কবির্তকের আবর্ত রচনা না করিয়া প্রাচীন কালের এক-একটি চিত্র অঙ্কিত করিলে পাঠকদিগের বাস্তবিক উপকার হয়। গুপ্ত মহাশয় যদি ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের

সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার প্রণালী তৎসাময়িক সাহিত্য ও অন্যান্য প্রমাণ হইতে উদ্ধার করিয়া চিত্রবৎ পাঠকদের সম্মুখে ধরিতে পারেন তবে সাহিত্যের একটি মহৎ অভাব দূর হয়।

সাহিত্য, অগ্রহায়ণ

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ০৬

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় এই সংখ্যায় “হিন্দু আর্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস’ প্রবন্ধে প্রাচীন হিন্দুদিগের সামাজিক ও গার্হস্থ জীবন বর্ণনা করিয়াছেন। কথায় কথায় তুমুল তর্কবিতর্কের ঝড় না তুলিয়া এবং মাকড়সার জালের মতো চতুর্দিকে ইংরাজি বাংলা নোটের দ্বারা মূল কথাটাকে আচ্ছন্ন ও লুপ্তপ্রায় না করিয়া তিনি প্রাচীন ইতিহাসকে ধারাবাহিক চিত্রের ন্যায় পাঠকের সম্মুখে সুন্দররূপে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেছেন এজন্য আমরা লেখকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। অজীর্ণ অন্নকে জীর্ণ অন্নের অপেক্ষা অধিক গুরুভার বলিয়া অনুভব হয়, সেই কারণে রমেশবাবুর এই ঐতিহাসিক প্রবন্ধ অনেক পাঠকের নিকট তেমন গুরুতর বলিয়া প্রতিভাত হইবে না; তাঁহারা মনে করিবেন ইহাতে যথেষ্ট “গবেষণা’ প্রকাশ হয় নাই; পড়িতে নিতান্ত সহজ হইয়াছে। বিপর্যয় পাণ্ডিত্য এবং ঐতিহাসিক ব্যায়াম-নৈপুণ্য আমরা বিস্তর দেখিয়াছি। তর্কের ধূলায় অস্পষ্ট প্রাচীন জগৎ উত্তরোত্তর অস্পষ্টতর হইয়া উঠিতেছে; রমেশবাবু নিজের পাণ্ডিত্য আড়ালে রাখিয়া আলোচ্য বিষয়টিকেই যে প্রকাশমান করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে আমরা বড়ো আনন্দ লাভ করিয়াছি। লতাগুল্মসমাকীর্ণ অন্ধকার অরণ্যপথ ছাড়িয়া সহসা যেন একেবারে রাজপথে আসিয়া পড়িয়াছি।

সাধনা, পৌষ, ১২৯৮। নব্যভারত, পৌষ, ১২৯৮

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ০৭

পূর্ব মাস হইতে সাহিত্যে “রায় মহাশয়’ নামক এক উপন্যাস বাহির হইতেছে। গল্পটি শেষ না হইলে কোনো মত দেওয়া যায় না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি ভাষাটি পরিষ্কার এবং সরস, ও পল্লীগ্রামের জমিদারি সেরেস্তার বর্ণনা অতিশয় যথাযথরূপে চিত্রিত হইতেছে। মাননীয়া শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস “অশিক্ষিতা ও দরিদ্রা নারী’ নামক প্রবন্ধে স্ত্রীজাতি, যে, “সকল দেশে ও সকল অবস্থাতেই একরূপ কোমল প্রেমে ভূষিত, একরূপ সহিষ্ণুতায় মণ্ডিত ও একপ্রকার দৃঢ়তায় আবৃত’ তাহাই প্রমাণ করিয়াছেন, এবং বলিয়াছেন “এ জগতে যদি তাহাদের সেই কোমলতা, সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার অপব্যবহার না হইত, তাহা হইলে, আজ আর নারীজাতির শ্রেষ্ঠতার বিষয়ে তর্কবিতর্কের কিছুমাত্র আবশ্যক রহিত না।’ এখনো কোনো আবশ্যক দেখি না। যাহা সত্য তাহা স্বতই সত্য, তর্কবিতর্কের সাহায্যবশতই সত্য নহে। নিকৃষ্টতা কখনোই শ্রেষ্ঠতাকে পরাভূত করিয়া রাখিতে পারে না। অতএব শ্রেষ্ঠতা আপনিই প্রতিপন্ন হইবে। কেহ যদি-বা মুখে তাহাকে অস্বীকার করে তাহাতে তাহার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, কারণ, কার্যে তাহার গৌরব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু আজকাল কোনো কোনো নারীলেখক এই প্রমাণকার্যে এতই প্রাণপণে লাগিয়াছেন যে, মনে হয়, এ বিষয়ে যেন তাঁহাদের নিজেরই মনে কথঞ্চিৎ সংশয় আছে। আমার বোধ হয় স্বশ্রেণীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে অতিমাত্র সচেতন না হইয়া নিরভিমান ও সহজভাবে আত্মকর্তব্য সম্পন্ন করিয়া যাওয়ার মধ্যে একটি সুন্দর শ্রেষ্ঠতা আছে; আজকাল নারীগণ সেই শ্রেষ্ঠতা হইতে বিচ্যুত হইবার আয়োজন করিতেছেন। আর-একটি কথা আছে; যে রমণীগণ আপনাদের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতেছেন তাঁহাদের এইটি স্মরণ রাখা উচিত যে, যুগযুগান্তর হইতে যে কর্তব্যপথ অবলম্বন করিয়া তাঁহারা আজি এই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন, সে পথ ত্যাগ করিলে ক্রমশ কীরূপ অবস্থা ঘটিবে বলা কঠিন। নারী নারী বলিয়াই শ্রেষ্ঠ, তিনি পুরুষের কার্যে হস্তক্ষেপ করিলে যে শ্রেষ্ঠতর হইবেন তাহা নহে বরং বিপরীত ঘটিতে পারে; তাহাতে তাঁহাদের চরিত্রের কোমলতা,

সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তার সামঞ্জস্য নষ্ট হওয়া আশ্চর্য নহে।– বর্তমান সংখ্যায় সাহিত্যসম্পাদক মহাশয় সাধনার সমালোচনা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে সবিশেষ উৎসাহিত করিয়াছেন।

সাহিত্য, পৌষ, ১২৯৮

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ০৮

এই নামে এক নূতন মাসিক পত্র বাহির হইতেছে। বর্তমান সংখ্যায় শ্রীযুক্ত সখারাম গণেশ দেউস্কর “এটা কোন্ যুগ’ নামক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। লেখাটি বিশেষ কৌতুকাবহ। লেখক মনুসংহিতা, মহাভারত ও হরিবংশ হইতে দেখাইয়াছেন যে সত্যযুগ চারি সহস্র বৎসরে, ত্রেতাযুগ তিন সহস্র বৎসরে, দ্বাপরযুগ দুই সহস্র বৎসরে ও কলিযুগ এক সহস্র বৎসরে সম্পূর্ণ হয়। সর্বসমেত চারি যুগের পরিমাণ দ্বাদশ সহস্র বৎসর। প্রচলিত পঞ্জিকানুসারে কলিযুগ আরম্ভের পর ৪৯৯২ বৎসর অতীত হইয়াছে। সুতরাং মনুর মতে খৃষ্টজন্মের ১৯০০ বৎসর পূর্বেই কলিযুগ শেষ হইয়াছে। তবে এখন এটা কোন্ যুগ! কুল্লুকভট্ট ও মেধাতিথি ইহার মীমাংসা চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন এই-সকল যুগবৎসর দৈব বৎসর। বাইবেলের সাপ্তাহিক সৃষ্টি বর্ণনার সহিত বিজ্ঞানের ঐক্য হয় না দেখিয়া য়ুরোপের অনেক খৃস্টান এইরূপ দৈব দিনের কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু এই দৈব বৎসরের কথা লেখক পরিষ্কাররূপে খণ্ডন করিয়াছেন। লেখক যে প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন তাহার কোনো উত্তর দেন নাই। উত্তর দেওয়াও কঠিন বটে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি আজকাল হঠাৎ সত্যযুগের লক্ষণ দেখা দিয়াছে; আর কোথাও না হৌক বাংলা দেশে। ভারতবর্ষের পূর্বপ্রান্তে কলির কুয়াশা ক্রমেই কাটিয়া উঠিতেছে এবং এক রাত্রির মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার নব নব কুশাঙ্কুর সূচির মতো জাগিয়া উঠিয়া গত কলিযুগের বকেয়া পাপীদিগের পথ চলা বন্ধ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে। অতএব পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পূর্বাচলে নব সত্যযুগের অভ্যুদয় যে আরম্ভ হইয়াছে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান, কার্তিক, ১২৯৮

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ০৯

‘–লয়। এই প্রবন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবু পরব্রহ্মে বিলীন হইবার কামনা ও সাধনাই যে হিন্দুর হিন্দুত্ব তাহাই নির্দেশ করিয়াছেন। এবং প্রবন্ধের উপসংহারে আক্ষেপ করিয়াছেন য়ুরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই জাতীয়তা সংকটাপন্ন হইয়াছে, অতএব তাহা প্রাণপণে রক্ষা করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য। এ সম্বন্ধে আমাদের গুটিকতক কথা বলিবার আছে। ব্রহ্মে বিলীন হইবার সাধনা জাতীয়তা রক্ষার বিরোধী। কারণ সে সাধনার নিকট কোথায় গৃহবন্ধন, কোথায় সমাজবন্ধন, কোথায় জাতীবন্ধন! অতএব জাতীয়তা বিনাশচেষ্টাকেই যদি হিন্দুর জাতীয়তা বলা হয় তবে সে জাতীয়তা ধ্বংস করাই, যে, আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাহা অস্বীকার করা যায় না। জগৎকে মায়া এবং চিত্তবৃত্তিকে মোহ বলিয়া স্থির করিলে বিজ্ঞানচর্চা বিদ্যাচর্চা সৌন্দর্যচর্চা সমস্তই নিষ্ফল এবং অনিষ্টকর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। আমি ছাড়া যতদিন আর-কিছুকে দেখিতে পাইব অনুভব করিতে পারিব ততদিন আমি মায়াবদ্ধ; যখন আমি ছাড়া আর কেহ নাই কিছু নাই, অতএব যখন আমিও নাই (কারণ, অন্যের সহিত তুলনা করিয়াই আমির আমিত্ব) তখন সাধনার শেষ, মায়ামোহের বিনাশ। এমন সর্বনাশিনী জাতীয়তা যদি হতভাগ্য হিন্দুর স্কন্ধে আবির্ভূত হইয়া থাকে তবে সেটাকে প্রাণপণে বিলুপ্ত করা আমাদের সকলের একান্ত কর্তব্য । এই অসীম বৈরাগ্যতত্ত্ব আমাদের হিন্দুসমাজের অন্তরে অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে এ কথা সত্য|, তাহার ফল হইয়াছে আমাদের এ কূল ও কূল দুই গেছে । প্রত্যেকে এক-একটি সোহহং ব্রহ্ম হইতেও পারি নাই অথচ মনুষ্যত্ব একেবারে নির্জীব হইয়া আছে । মরণও হয় না, অথচ ষোলো আনা বাঁচিয়াও নাই। প্রকৃতিনিহিত প্রীতিবৃত্তিকে দর্শনশাস্ত্রের বিরাট পাষাণ একেবারে পিষিয়া ফেলিতে পারে নাই অথচ তাহার কাজ করিবার বল ও উৎসাহ যথাসম্ভব অপহরণ করা হইয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে এরূপ বিরাট নাস্তিকতা মহামারীর মতো সমস্ত বৃহৎ জাতিকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিতে পারে না। সেইজন্য আমাদের দেশে মুখে মুখে বৈরাগ্যের কথা

প্রচলিত,কিন্তু তৎসত্ত্বেও মানুষের প্রতি, সংসারের প্রতি, সৌন্দর্যের প্রতি নিগূঢ় অনুরাগ চিরানন্দস্রোতে মনুষ্যত্বকে যথাসাধ্য সতেজ ও সফল করিয়া অন্তরে অন্তরে প্রবাহিত হইতেছে । বিরাট নিপীড়নে সেই প্রেমানন্দকে পরাহত করিতে পারে নাই বলিয়াই চৈতন্য আসিয়া যেমনি প্রেমের তান ধরিলেন অমনি “বিরাট’ হিন্দুর “বিরাট’ হৃদয়ের কঠোর পাষাণ ভেদ করিয়া প্রেমের স্রোত আনন্দধারায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আবার কি সেই বিরাট পাষাণখানাকে তিল তিল করিয়া গড়াইয়া জগতের অনন্ত জীবন-উৎসের মুখদ্বারে তুলিয়া বিরাট হিন্দুর বিরাট জাতীয়তা রক্ষা করিতে হইবে? কিন্তু হে বিরাট বিরাগী সম্প্রদায়, এ স্রোত তোমাদের দর্শনশাস্ত্রের সাধ্য নহে রুদ্ধ করা|, যদি বা কিছুকালের মতো কিয়ৎপরিমাণে প্রতিহত থাকে আবার একদিন চতুগু□ বলে সমস্ত বাধা বিদীর্ণ করিয়া শাস্ত্রদগ্ধ শুষ্ক শূন্য বিরাট বৈরাগ্যমরুকে প্রাণ-স্রোতে প্লাবিত করিয়া কোমল করিয়া শ্যামল করিয়া সুন্দর করিয়া তুলিবে।

আমাদের আর-একটি কথা বলিবার আছে । আজকাল আমরা যখন স্বজাতির গুণগরিমা- কীর্তনে প্রবৃত্ত হই, তখন আমরা অন্য জাতিকে খাটো করিয়া আপনাদিগকে বড়ো করিতে চেষ্টা করি । তাহার একটা উপায়, স্বদেশে যে মহোচ্চ অদর্শ কেবল শাস্ত্রেই আছে সাধারণের মধ্যে নাই তাহার সহিত অন্য দেশের সাধারণ-প্রচলিত জীবনযাত্রার তুলনা করা। দুঃখের বিষয়, চন্দ্রনাথবাবুর লেখাতেও সেই অন্যায় অনুদারতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি বলিতে চান হিন্দুরা কেবল ব্রহ্মত্ব লাভের জন্যেই নিযুক্ত, আর য়ুরোপীয়েরা কেবল আত্মসুখের জন্যই লালায়িত । তিনি একদিকে বিষ্ণুপুরাণ হইতে প্রহ্লাদচরিত্র উদ্‌ধৃত করিয়াছেন, অন্য দিকে য়ুরোপীয়দের কথায় বলিয়াছেন “ক্ষুধায় অন্ন এক মুঠা কম পাইলে,তৃষ্ণায় জল এক গণ্ডূষ কম পাইলে, শীতে একখানি কম্বল কম হইলে, চায়ের বাটিতে এক ফোঁটা চিনির অভাব হইলে, স্নান করিয়া একখানি বুরুশ না পাইলে, বেশবিন্যাসে একটি আলপিন কম হইলে তাহারা কাঁদিয়া রাগিয়া চেঁচাইয়া মাহাপ্রলয় করিয়া তোলে।’

চন্দ্রনাথবাবু যদি স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিয়া দেখেন তো দেখিতে পাইবেন, আমাদের দেশেও আদর্শের সহিত আচরণের অনেক প্রভেদ। নিগু□ ব্রহ্ম হইয়া যাওয়া যদি আমাদের আদর্শ হয় তবে ব্যবহারে তাহার অনেক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় । এত দেব এত দেবী এত কাষ্ঠ এত পাষাণ এত কাহিনী এত কল্পনার দ্বারা ব্রহ্মের উচ্চ আদর্শ কোন্ দেশে আচ্ছন্ন করিয়াছে! আমাদের দেশের নরনারীগণ কি প্রতিদিন মৃন্মূর্তির নিকট ধন পুত্র প্রভৃতি ঐহিক সুখসম্পত্তি প্রার্থনা করিতেছে না? মিথ্যা মকদ্দমায় জয়লাভ করিবার জন্য তাহারা দেবীকে কি বলির প্রলোভন দেখাইতেছে না? নিরপরাধী বিপক্ষকে বিনাশ করিবার জন্য তাহারা কি দেবতাকে নিজপক্ষ অবলম্বন করিতে স্তুতিবাক্যে অনুরোধ করিতেছে না? তাহারা কি নিজের স্বাস্থ্যের জন্য স্বস্ত্যয়ন ও প্রতিযোগীর ধ্বংসের জন্য হোমযাগ করে না? রাগদ্বেষ হিংসা মিথ্যাব্যবহার এবং বিবিধ কলঙ্কমসি দ্বারা তাহারা কি আপনাদের দেবচরিত্র অঙ্কিত করে নাই? শাস্ত্রের মধ্যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম এবং মন্দিরের মধ্যে বিকৃত কল্পনা এমন আর কোথায় আছে!

অতএব তুলনার স্থলে আমাদের দেশের আদর্শের সহিত যুরোপের আদর্শের তুলনাই ন্যায়সংগত ।

যুরোপীয় সভ্যতার আদর্শ আত্মসুখ নহে, বিশ্বসুখ। মনুষ্যত্বের চরম পরিণতি সাধনই তাহার সাধনার বিষয়। জ্ঞান এবং প্রেম, “মাধুর্য এবং জ্যোতি’ সমস্ত মানব-সাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া তাহার উদ্দেশ্য। তাহাদের কবি সেই গান গাহিতেছে, তাহাদের মহাপুরুষ ও মহানারীগণ সেই উদ্দেশ্যে দেশদেশান্তরে জীবন বিসর্জন করিতেছে । আবার এদিকে সাধারণের মধ্যে আত্মসুখান্বেষণও বড়ো কম নহে; এদিকে পরের ধনে লোভ দিতে, পরের অন্ন কাড়িয়া খাইতে, পরের সুখ ছারখার করিতে ইহারা সকল সময়ে বিমুখ নহে। এবং এক দিকে ইহারা হিংস্র বিদেশের মরুনির্বাসনে একাকী ধর্মপ্রচার করিতে ও তুষার-কঠিন দুর্গম উত্তর মেরুর নিষ্ঠুর শীতের মধ্যে জ্ঞানান্বেষণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, অন্য দিকে স্নানের পর বুরুশ না পাইলে এবং বেশবিন্যাসে আলপিনটি কম হইলে বাস্তবিক অস্থির হইয়া পড়ে। মানুষ এমনি মিশ্রিত, এমনি অদ্ভুত অসম্পূর্ণ জীব।

সর্বশেষে পাঠকদিগকে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা য়ুরোপীয় সভ্যতার যে আদর্শভাব উপরে উল্লেখ করিয়াছি বঙ্কিমবাবু তাঁহার "ধর্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন আমাদের হিন্দুধর্মেরও সেই আদর্শ- অর্থাৎ মানুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশসাধন। চন্দ্রনাথবাবুর মতে হিন্দুধর্মের আদর্শ মনুষ্যত্বের পূর্ণ ধ্বংসসাধন। তিনি বলেন হিন্দুধর্মের মূল মন্ত্র প্রলয়। এখন হিন্দুগণ বঙ্কিমবাবুর মতে বাঁচিবেন কি চন্দ্রনাথবাবুর মতে মরিবেন সেই একটা সমস্যা উঠিতে পারে। আমরা এ বিষয়ে একটা মত স্থির করিয়াছি। আমরা জীবনের প্রয়াসী, এবং ভরসা করি, লয় ব্যাপারটা যতই "বিরাট' হোক তাহার এখনো বিস্তর বিলম্ব আছে।

সাধনায় [অগ্রহায়ণ ১২৯৮] আমরা "শিক্ষিতা নারী' নামক প্রবন্ধের যে সমালোচনা প্রকাশ করিয়াছিলাম বর্তমান সংখ্যায় তাহার উত্তর বাহির হইয়াছে। লেখিকা বলিয়াছেন আমরা তাঁহার প্রবন্ধের মর্ম ভুল বুঝিয়াছিলাম। ভুল বুঝিবার কিঞ্চিৎ কারণ ছিল। তিনি আমেরিকার স্ত্রী-অ্যাটর্নি, স্ত্রী-বক্তা প্রভৃতি প্রবলা রমণীদের কথা এমনভাবে লিখিয়াছিলেন যাহাতে সহজেই মনে হইতে পারে যে, তিনি উক্ত ধনোপার্জনকারিণীদিগকে প্রধানত, শিক্ষিতা নারীর আদর্শস্থলরূপে খাড়া করিতে চাহেন। তাঁহার যদি এরূপ উদ্দেশ্য না থাকে তবে আমাদের সহিত তাঁহার মতান্তর দেখি না। কেবল এখনও তিনি "নারীজাতির অবরোধ ও অশিক্ষিত জীবনের মূলে যে পুরুষের স্বার্থপরতা বা উৎপীড়ন' এ অভিযোগ ছাড়েন নাই। লেখিকা ভাবিয়া দেখিবেন "মূল' বলিতে অনেকটা দূর বুঝায়। যদি আমরা বাঙালিরা বলি ইংরাজের স্বার্থপরতাই বাঙালির জাতীয় অধীনতার মূল তাহা হইলে তাহাতে দুর্বল প্রকৃতির বিবেচনাশূন্য কাঁদুনি প্রকাশ পায় মাত্র। ইংরাজ আপন স্বার্থপর প্রবৃত্তি আমাদের উপর খাটাইতেই পারিত না যদি আমরা গোড়ায় দুর্বল না হইতাম। অতএব স্বার্থপরতাকেই মূল না বলিয়া দুর্বলতাকেই মূল বলিয়া ধরা আবশ্যক। সকলপ্রকার অধীনতারই মূলে দুর্বলতা। লেখিকা বলিতে পারেন যে, এই সুসভ্য ঊনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক দুর্বলতাকে দুর্বলতা বলাই উচিত হয় না। কিন্তু বুদ্ধিচর্চা এবং জ্ঞানোপার্জনও বলসাধ্য। দুই জন লোকের যদি সমান বুদ্ধি থাকে এবং তাহাদের মধ্যে একজনের শারীরিক বল অধিক থাকে তবে বলিষ্ঠ ব্যক্তি বুদ্ধি-

সংগ্রামেও অন্যটিকে পরাভূত করিবে, শরীর ও মনের মধ্যে এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। তবে যদি প্রমাণ হয় স্ত্রীলোকের বুদ্ধিবৃত্তি পুরুষের অপেক্ষা অনেক বেশি তবে কথাটা স্বতন্ত্র হয়। যাহা হউক, প্রকৃতির পক্ষপাতের জন্য পুরুষকে অপরাধী করা উচিত হয় না। কারণ, পুরুষের পাপের বোঝা যথেষ্ট ভারী আছে। যেখানে ক্ষমতা সেখানে প্রায়ই ন্যূনাধিক অত্যাচার আছেই। ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ সংযত করিয়া চলা সর্বসাধারণের নিকট প্রত্যাশা করা যায় না; সেই কারণে, রমণীর প্রতি পুরুষের উপদ্রবের অপরাধ পর্বত-প্রমাণ স্তূপাকার হইয়া উঠিয়াছে; তাহার উপরে আবার একটা "ওরিজিনাল্ সিন্' একটা মূল পাপ পুরুষের স্কন্ধে চাপানো নিতান্ত অন্যায়। সেটা পুরুষের নহে প্রকৃতির। রমণীর কাছে পুরুষেরা সহস্র প্রেমের অপরাধে চির অপরাধী সেজন্য তাঁহারা সুমধুর অভিমানে আমাদিগকে দণ্ডিত করেন, সে-সকল আইন ঘরে ঘরে প্রচলিত; এমন-কি, তাহার দণ্ডবিধি বঙ্গসাহিত্যে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজকাল নারীরা পুরুষের নামে এ কী এক নূতন অভিযোগ অনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং আমাদিগকে নীরস ও নিষ্ঠুরভাবে র্ভৎসনা করিতেছেন। এরূপ অশ্রুজলশূন্য শুষ্ক শাসনের জন্য আমরা কোনোকালে প্রস্তুত ছিলাম না; এটা আমাদের কাছে নিতান্ত বেআইনি রকম ঠেকিতেছে ।- রমণী সৌন্দর্যে পুরুষের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (কেবল শারীরিক সৌন্দর্যে নহে)। দুর্ভাগ্যক্রমে মানবসমাজে সৌন্দর্যবোধ অনেক বিলম্বে পরিণতি লাভ করে। কিন্তু অনাদৃত সৌদর্যও প্রেমপরিপূর্ণ ধৈর্যের সহিত প্রতীক্ষা করিতে জানে; অন্ধবল তাহার সম্মুখে দম্ভ প্রকাশ করে বলিয়া বলের প্রতি তাহার কোনো ঈর্ষা নাই; সে সেই খেদে বলিষ্ঠ হইয়া বলকে অতিক্রম করিতে চায় না, সুন্দর হইয়া অতি ধীরে ধীরে জয়লাভ করে। যিশু খৃষ্ট যেরূপ মৃত্যুর দ্বারা অমর হইয়াছেন সৌন্দর্য সেইরূপ উৎপীড়িত হইয়াই জয়ী হয়। অধৈর্য হইবার আবশ্যক নাই; নারীর আদর কালক্রমে আপনি বাড়িবে, সেজন্য নারীদিগকে কোমর বাঁধিতে হইবে না; বরঞ্চ আরও অধিক সুন্দর হইতে হইবে। রাবণের ঘরে সীতা অপমানিতা; সেখানে কেবল পশুবল, সেখানে সীতা বন্দিনী। রামের ঘরে সীতা সম্মানিতা; সেখানে বলের সহিত ধর্মের মিলন, সেখানে সীতা স্বাধীনা। ধৈর্যকঠিন প্রেমকোমল সৌন্দর্যের অলক্ষ্য প্রভাবে মনুষ্যত্ব বিকশিত হইতে থাকিবে এবং সেই মনুষ্যত্ব বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যথার্থ পৌরুষ যখন

পরিণত হইয়া উঠিবে, তখন এই উদারহৃদয় পৌরুষই অনাদরের হাত হইতে সৌদর্যকে উদ্ধার করিবে; এজন্য নরীদিগকে লড়াই করিতে হইবে না।

সমালোচ্য প্রবন্ধের দুই-একটা বাংলা কথা আমাদেরর কানে নিরতিশয় বিলাতি রকম ঠেকিয়াছে এখানে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না, মাননীয়া লেখিকা মার্জনা করিবেন। “কর্ষিত বিচারশক্তি’ “মানসিক কর্ষণ’ শব্দগুলা বাংলা নহে। একস্থানে আছে “সংসারে যে গুরুতর কর্তব্য তাহার উপর অর্পিত হয়, তজ্জন্য, সমভাবময় হৃদয়ের ন্যায়, কর্ষিত মস্তকেরও একান্ত আবশ্যক।’ “সমভাবময় হৃদয়’ কোন্ ইংরাজি শব্দের তর্জমা ঠাহর করিতে পরিলাম না সুতরাং উহার অর্থ নির্ণয় করিতে অক্ষম হইলাম; “কর্ষিত মস্তক’ কথাটার ইংরাজি মনে পড়িতেছে কিন্তু বাংলাভাষার পক্ষে এ শব্দটা একেবারে গুরুপাক।

“সোম’ নামক প্রবন্ধে বৈদিক সোমরস যে সুরা অর্থেই ব্যবহৃত হইত না লেখক তাহাই প্রমাণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। “সোম’ বলিতে কী বুঝাইত ভবিষ্যৎসংখ্যক সাহিত্যে তাহার আলোচনা হইবে লেখক আশ্বাস দিয়াছেন। আমরা ঔৎসুক্যের সহিত প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

“রায় মহাশয়’ গল্পে বাংলার জমিদারি শাসনের নিষ্ঠুর চিত্র বাহির হইতেছে। ক্ষমতাশালী লেখকের রচনা পড়িয়া সমস্তটা অত্যন্ত সত্যবৎ প্রতীয়মান হয়; আশা করি, ইহার মধ্যে কিছু কিছু অত্যুক্তি আছে।

সাধনা, মাঘ, ১২৯৮। সাহিত্য, মাঘ, ১২৯৮

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ১০

“আলোক কি অন্ধকার?’ সম্পূর্ণ অন্ধকার। এবং এরূপ লেখায় সে অন্ধকার দূর হইবার কোনো সম্ভবনা নাই। কী করিলে ভারতবর্ষে জাতীয় জীবন সংঘটন হইতে পারিবে লেখক তাহারই আলোচনা করিয়াছেন। অবশেষে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন “হিন্দুধর্মের ন্যায় আর ধর্ম নাই, এমন কল্পবৃক্ষ আর জন্মিবে না– যাঁহার যে প্রকার ধ্যান-ধারণার শক্তি তিনি সেই প্রকারেই সাধনা করিতে পারেন; এমন ধর্ম আর কোথায়? ছিন্নভিন্ন ভারতকে আবার যদি কেহ এক করিতে পারে, আবার যদি কেহ ভারতকে উন্নত করিয়া তাহার শরীরে হৈমমুকুট পরাইতে পারে, তবে সে সনাতন হিন্দুধর্ম।’ লেখক মনে করিতেছেন কথাটা সমস্ত পরিষ্কার হইয়া গেল এবং আজ হইতে তাঁহার পাঠকেরা কেবল কল্পবৃক্ষের হাওয়া খাইয়া ভারতের “শরীরে হৈমমুকুট’ পরাইতে থাকিবে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। হিন্দুধর্ম কী? তাহা কবে ভারতবর্ষে ছিল না? তাহা কবেই বা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেল? তাহাকে আবার কোথা হইতে আনিতে হইবে এবং কোন্ “অবতার’ আনিবেন? যাঁহার যেরূপ শক্তি তিনি তদনুসারেই সাধনা করিতে পারিবেন এমন বহুরূপী ধর্মের মধ্যে ঐক্যবন্ধন কোন্‌খানে? এবং এই হিন্দুধর্মের প্রভাবে আদিম বৈদিক সময়ের পরে কোন্ কালে ভারতবর্ষে জাতীয় ঐক্য ছিল?

“সাঁওতালের শ্রাদ্ধ প্রণালী’ লেখাটি কৌতূহলজনক। “জাতীয় একতা’ প্রবন্ধে লেখক কৌতুক করিতেছেন কি জ্ঞান দান করিতেছেন সহসা বুঝা দুঃসাধ্য|; এই পর্যন্ত বলা যায় দুইটির মধ্যে কোনো উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয় নাই।

“দোকানদারী।’ বঙ্গসাহিত্যে এই ধরনের অশ্রুগদ্‌গদ সানুনাসিক প্রলাপোক্তি উত্তরোত্তর অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। কোনো উচ্চশ্রেণীর সাময়িক পত্রে এরূপ গদ্যপ্রবন্ধ কেন স্থান প্রাপ্ত হয় বুঝা কঠিন।

সাধনা, ফাল্গুন, ১২৯৮। নব্যভারত, মাঘ, ১২৯৮

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ১১

"সোম।' এই উৎকৃষ্ট প্রবন্ধে লেখক মহাশয় বেদ হইতে অনেকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করিতেছেন বেদে সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম বুঝায়। সোম বলিতে ঈশ্বরপ্রেম রূপকভাবে বুঝাইত, না তাহার প্রকৃত অর্থই এই, লেখক মহাশয় কোথাও তাহার আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে পড়িতেছে না। সুরাপানের আনন্দের সহিত ঈশ্বরপ্রেমানন্দের তুলনা অন্যত্রও পাওয়া যায়, হাফেজের কবিতা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। রামপ্রসাদের কোনো গানেও তিনি সুরাকে আধ্যাত্মিক ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাহা হইতে প্রমাণ হয় না যে, তান্ত্রিকেরা কেবলমাত্র আধ্যাত্মিক সুরাই সেবন করিয়া থাকেন। যাহা হউক, এখনো আমাদের সম্পূর্ণ সন্দেহ মোচন হয় নাই।

"আহার।' শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয় বলেন "আমাদের মহাজ্ঞানী ও সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকারেরা আহারকে ধর্মের অন্তর্গত করিয়া গিয়াছেন।' এই ভাবের কথা আমরা অনেক দিন হইতে শুনিয়া আসিতেছি, কিন্তু ইহার তাৎপর্য সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। অনেকেই গৌরব করিয়া থাকেন আমাদের আহার ব্যবহার সমস্তই ধর্মের অন্তর্ভূত– কিন্তু এখানে ধর্ম বলিতে কী বুঝায়? যদি বল ধর্মের অর্থ কর্তব্যজ্ঞান, মানুষের পক্ষে যাহা ভালো তাহাই তাহার কর্তব্য, ধর্ম এই কথা বলে, তবে জিজ্ঞাসা করি সে কথা কোন্ দেশে অবিদিত! শরীর সুস্থ রাখা যে মানুষের কর্তব্য, যাহাতে তাহার কল্যাণ হয় তাহাই তাহার অনুষ্ঠেয় এ কথা কে না বলে! যদি বল, এ স্থলে ধর্মের অর্থ পরলোকে দণ্ড-পুরস্কারের বিধান, অর্থাৎ বিশেষ দিনে বিশেষ ভাবে বিশেষ আহার করিলে শিবলোক প্রাপ্তি হইবে এবং না করিলে চতুর্দশ পুরুষ নরকস্থ হইবে, ধর্ম এই কথা বলে, তবে সেটাকে সত্য ধর্ম বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কোনো এক মহাজ্ঞানী সূক্ষ্মদর্শী শাস্ত্রকার লিখিয়া গিয়াছেন মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে গঙ্গাস্নান করিলে "ত্রিকোটিকুলমুদ্ধরেৎ'; মানিয়া লওয়া যাক উক্ত ত্রয়োদশীতে নদীর জলে স্নান করিলে শরীরের স্বাস্থ্যসাধন হয়, কিন্তু ইহার মধ্যে গৌরবের অংশ কোন্টুকু?

ওই পুরস্কারের প্রলোভনটুকু? কেবল ওই মিথ্যা প্রলোভন সূত্রে এই স্বাস্থ্যতত্ত্ব অথবা আধ্যাত্মিক তত্ত্বের নিয়মটুকুকে ধর্মের সহিত গাঁথা হইয়াছে। নইলে, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন করা ভালো, এবং যাহা ভালো তাহাই কর্তব্য এ কথা কোন্ দেশের লোক জানে না? আহারের সময় পূর্বমুখ করিয়া উপবেশন করিলে তাহাতে পরিপাকের সহায়তা ও তৎসঙ্গে মানসিক প্রসন্নতার বৃদ্ধি সাধন করে অতএব পূর্বমুখে আহার করা ধর্মবিহিত এ কথা বলিলে প্রমাণ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে কিন্তু মূল কথাটা সম্বন্ধে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিতে পারে না। কিন্তু যদি বলা হয পুর্বমুখে আহার না করিলে অপবিত্র হইয়া ত্রিকোটিকুলসমেত নরকে পতিত হইতে হইবে, ইহা ধর্ম, অতএব ইহা পালন করিবে, তবে এ কথা লইয়া গৌরব করিতে পারি না। যাহার সত্য মিথ্যা প্রমাণের উপর নির্ভর করে, যে-সকল বিষয় সমন্ধে জ্ঞানোন্নতি সহকারে মতের পরিবর্তন কিছুই অসম্ভব নহে তাহাকে কী বলিয়া ধর্মনিয়মভুক্ত করা যায়? স্বাস্থ্য রক্ষা করা মানুষের কর্তব্য অতএব তাহা ধর্ম এ মূলনীতির কোনোকালে পরিবর্তন সম্ভব নহে, কিন্তু কোনো একটা বিশেষ উপায়ে বিশেষ দ্রব্য আহার করা ধর্ম, না করা অধর্ম, এরূপ বিশ্বাসে গুরুতর অনিষ্টের কারণ ঘটে।

মানব নীতির দুই অংশ আছে, এক অংশ স্বতঃসিদ্ধ, এক অংশ যুক্তিসিদ্ধ। আধুনিক সভ্য জাতিরা এই দুই অংশকে পৃথক করিয়া লইয়াছেন; এই অংশকে ধর্মনৈতিক ও অপর অংশকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। একদিকে এই ধ্রুব শক্তি এবং অপর দিকে চঞ্চল শক্তির স্বাতন্ত্র্যই সমাজ-জীবনের মূল নিয়ম। সকলেই জানেন, আকর্ষণ শক্তি না থাকিলে জগৎ বাষ্প হইয়া অনন্তে মিশাইয়া যাইত এবং বিপ্রকর্ষণ শক্তি না থাকিলেও বিশ্বজগৎ বিন্দুমাত্রে পরিণত হইত। তেমনি অটল ধর্মনীতির বন্ধন না থাকিলে সমাজ বিছিন্ন হইয়া সমাজ আকার ত্যাগ করে , এবং চঞ্চল লোকনীতি না থাকিলে সমাজ জড় পাষাণবৎ সংহত হইয়া যায়। আধুনিক হিন্দুসমাজে খাওয়া শোয়া কোনো বিষয়েই যুক্তির স্বাধীনতা নাই, সমস্তই এক অটল ধর্মনিয়মে বদ্ধ এ কথা যদি সত্য হয় তবে ইহা আমাদের গৌরবের আমাদের কল্যাণের বিষয় নহে। চন্দ্রনাথবাবুও

অন্যত্র এ কথা একরূপ স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, "হিন্দুশাস্ত্রের নিষিদ্ধ দ্রব্যের মধ্যে কোনোটি ভক্ষণ করিয়া যদি মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট না হয় তবে সে দ্রব্যটি ভক্ষণ করিলে তোমার হিন্দুয়ানিও নষ্ট হইবে না তোমার হিন্দু নামেও কলঙ্ক পড়িবে না।' অর্থাৎ এ-সকল বিষয় ধ্রুব ধর্ম-নিয়মের অন্তর্গত নহে। ইহার কর্তব্যতা প্রমাণ ও অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

কিন্তু এই একটিমাত্র কথায় চন্দ্রনাথবাবু বর্তমান হিন্দুসমাজের মূলে আঘাত করিতেছেন। আমি যদি বলি গোমাংস খাইলে আমার মানসিক প্রকৃতির অনিষ্ট হয় না, আমি যদি প্রমাণস্বরূপে দেখাই গোমাংসভুক্ যাজ্ঞবল্ক্য অনেক কুষ্মাণ্ডভূক্ স্মার্তবাগীশের অপেক্ষা উচ্চতর মানসিক প্রকৃতিসম্পন্ন, তবে কি হিন্দুসমাজ আমাকে মাপ করিবেন? যদি কোনো ব্রাহ্মণ শ্রদ্ধাস্পদ চন্দ্রনাথবাবুর সহিত একাসনে বসিয়া আহার করেন এবং প্রমাণ করেন তাহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রকৃতির কিছুমাত্র বিকার জন্মে নাই, তবে কি তাঁহার হিন্দুনামে কলঙ্ক পড়িবে না? যদি না পড়ে, এই যদি হিন্দুধর্ম হয়, হিন্দুধর্মে যদি মূল ধর্মনীতিকে রক্ষা করিয়া আচার সম্বন্ধে স্বাধীনতা দেওয়া থাকে তবে এতক্ষণ আমরা বৃথা তর্ক করিতেছিলাম।

"কাশ্মীর'। এরূপ সাময়িক প্রসঙ্গ লইয়া বাংলা কাগজে প্রায়ই লেখা হয় না। তাহার কারণ, উপযুক্ত লেখক পাওয়া কঠিন। কেবল অন্ধভাবে ইংরাজি কাগজের অনুবাদ বা প্রতিবাদ করিলে সকল সময়ে সত্য পাওয়া যায় না। নগেন্দ্রবাবু কাশ্মীরের বর্তমান বিপ্লব সম্বন্ধে এই যে প্রস্তাব লিখিয়াছেন ইহা কোনো কাগজের প্রতিধ্বনি নহে, ইহা তিনি যেন রঙ্গভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া লিখিয়াছেন। সমালোচ্য প্রবন্ধটি বিশেষ সমাদরণীয়।

সাহিত্য, ফাল্গুন, ১২৯৮

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ১২

–"পঞ্জিকা বিভ্রাট'। প্রবন্ধটি ভালো এবং আবশ্যক কিন্তু সাধারণের আয়ত্তগম্য নহে। "জীবন ও কাব্য'।– লেখক বলিতেছেন, কবির জীবনের সঙ্গে তাঁহার কবিতার ঘনিষ্ঠ যোগ থাকে। গাছের সঙ্গে ফলের যোগ আছে বলাও যেমন বাহুল্য, কবির প্রকৃতির সঙ্গে কাব্যের প্রকৃতির যোগ আছে এ কথা বলাও তেমনি বাহুল্য। কিন্তু লেখক একটি নূতন সমাচার দিয়াছেন– তিনি বলেন বর্তমান বাংলা কবিদের জীবনের সহিত কাব্যের সামঞ্জস্য নাই। বঙ্গকবিদের জীবনবৃত্তান্ত লেখক কোথা হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করিলেন বলা শক্ত। সামান্যতম মানবজীবনেও কত প্রহেলিকা কত রহস্য আছে, তাহা উদ্‌ভেদ করিতে কত যত্ন, কত নিপুণতা, কত সহৃদয়তার আবশ্যক। লেখক ঘরে বসিয়া অবজ্ঞাভরে বঙ্গ-কবিদের জীবনের উপর দিয়া যে, তাঁহার মহৎ লেখনীর একটা কালির আঁচড় চালাইয়া গিয়াছেন কাজটা তাঁহার মতো লোকের উচিত হয় নাই। কারণ, তাঁহার প্রবন্ধে তিনি খুব উচ্চদরের নীতি-উপদেশ দিয়াছেন , অতএব লেখার সহিত লেখকের জীবনের যদি অবশ্যম্ভাবী যোগ থাকে তবে তাঁহার নিকট হইতেও ন্যায়াচরণ সম্বন্ধে মহৎ দৃষ্টান্ত প্রত্যাশা করিতে পারি। যাহা হউক, একটা কথা স্মরণ রাখা উচিত– আজকালকার কবি যদি কাব্যে কাপট্য করেন সত্য হয়, যাঁহারা সমালোচনা করেন কবিকে উপদেশ দেন তাঁহারা যে অকৃত্রিম সারল্য প্রকাশ করিয়া থাকেন তাহারও প্রমাণ আবশ্যক। আসল কথা, কাব্যই লিখুন আর সমালোচনাই লিখুন, সকল বিষয়েই অধিকার অনধিকার আছে, তাহাই বুঝিতে না পারিয়া অনেক লেখক মিথ্যা কাব্য লেখেন এবং অনেক সমালোচক কাব্য হইতে যথার্থ সত্য ও সৌন্দর্য উদ্ধার করিতে অক্ষমতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

"সুখাবতী'। বিখ্যাত ভ্রমণকারী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় সুখাবতী অর্থাৎ বৌদ্ধ স্বর্গ সম্বন্ধে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। হিন্দু-মুসলমানদের স্বর্গে যেরূপ ভোগের প্রলোভন আছে বৌদ্ধদের স্বর্গে সেরূপ নাই। বৌদ্ধ স্বর্গে প্রাণীগণ হিংসাদ্বেষ ভুলিয়া পরস্পরের উপকার ও সুখবর্ধনে নিযুক্ত। "তাঁহাদের এই মূলমন্ত্র যে, জগতে যাহ-কিছু সুখ আছে,

সমস্তই পরের উপকার করিতে বাসনা করিলেই লাভ করা যায়। স্বার্থচিন্তাতে কেবল অনবচ্ছিন্ন দুঃখরাশিই উৎপন্ন হইয়া থাকে, কল্পবৃক্ষগণেরও ফলপ্রদান সময়ে স্বভাবতই শরীর কম্পিত হইয়া থাকে, অপরিসীম ক্ষীর সমুদ্রও অমৃতাভিলাষী দেবগণ -কর্তৃক মথিত হইয়া কম্পিত হন, কিন্তু সুখাবতীবাসী বোধিসত্ত্বগণ পরার্থে শত শতবার শরীর দানে নিষ্কম্পভাবে দণ্ডায়মান হইতে সমর্থ। সে সময়ে তাঁহাদের দেহ আনন্দে পুলকোৎকর বহন করে'। আমরা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিলাম।

চৈত্র মাসের “সাহিত্যে ' শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত মহাশয় “প্রাচীন ভারত' প্রবন্ধে খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজা শিলাদিত্যের রাজত্বকালীন “সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব' ব্যাপারের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। শিলাদিত্যের রাজত্বকালে পাঁচবার এই উৎসবকার্য যথাবিধি সম্পাদিত হইয়াছিল।...

গঙ্গাযমুনার সংগম-স্থল পরম পবিত্র প্রয়াগ এই মহোৎসবের ক্ষেত্রে। এই স্থানের পাঁচ-ছয় মাইল পরিমাণের বিস্তীর্ণ ভূমিতে উৎসবকার্য্য সম্পন্ন হইত। দীর্ঘকাল হইতে এই ভূমি “সন্তোষক্ষেত্র' নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছিল। এই ক্ষেত্রের চারি হাজার বর্গফিট পরিমিত ভূমি গোলাপ ফুলের গাছে পরিবেষ্টিত হইত। পরিবেষ্টিত স্থানের বৃহৎ বৃহৎ গৃহে, স্বর্ণ ও রৌপ্য, কার্পাস ও রেশমের নানাবিধ বহুমূল্য পরিচ্ছেদ এবং অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য স্তূপাকারে সজ্জিত থাকিত। এই বেষ্টিত স্থানের নিকটে ভোজনগৃহ-সকল বাজারের দোকানের ন্যায় শ্রেণীবব্ধভাবে শোভা পাইত। এই-সমস্ত গৃহের এক-একটিতে একেবারে প্রায় সহস্র লোকের ভোজন হইতে পারিত। উৎসবের অনেক পূর্বে সাধারণ্যে ঘোষণা দ্বারা ব্রাহ্মণ, শ্রমণ, নিরাশ্রয়, দুঃখী বা মাতাপিতৃহীন, আত্মীয়বন্ধুশূন্য, নিঃস্ব ব্যক্তিদিগেকে নির্দিষ্ট সময়ে পবিত্র প্রয়াগে আসিয়া দানগ্রহণের জন্য আহ্বান করা হইত। মহারাজ শিলাদিত্য আপনার মন্ত্রী ও করদ রাজগণের সহিত এই স্থানে উপস্থিত থাকিতেন। বল্লভী-রাজ ধ্রুবপতু ও আসাম-রাজকুমার এই করদ রাজগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন। এই করদ রাজা ও মহারাজ শিলাদিত্যের সৈন্য, সন্তোষক্ষেত্রের চারি দিক বেষ্টন

করিয়া থাকিত। ধ্রুবপতুর সৈন্যের বহুসংখ্য অভ্যাগত লোক আপনাদের তাম্বু স্থাপন করিত।

অসীম আড়ম্বরের সহিত উৎসবের কার্য আরম্ভ হইত। শিলাদিত্য বৌদ্ধধর্মের পরিপোষক হইলেও হিন্দুধর্মের অবমাননা করিতেন না, তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ, উভয়কেই আদরসহকারে আহ্বান করিতেন, এবং বুদ্ধের প্রতিকৃতি ও হিন্দু দেব-মূর্তি উভয়ের প্রতিই সম্মান দেখাইতেন। প্রথম দিন পবিত্র মন্দিরে বুদ্ধের প্রতিমূর্তি স্থাপিত হইত। এই দিনে সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য দ্রব্য বিতরিত হইত, এবং সর্বাপেক্ষা সুখাদ্য দ্রব্য অতিথি-অভ্যাগতদিগকে দেওয়া যাইত। দ্বিতীয় দিনে বিষ্ণু ও তৃতীয় দিনে শিবের মূর্তি মন্দিরের শোভা বিকাশ করিত। প্রথম দিনের বিতরিত দ্রব্যের অর্ধাংশ এই এক-এক দিনে বিতরণ করা হইত। চতুর্থ দিন হইতে সাধারণ দান-কার্য আরম্ভ হইত। কুড়ি দিন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণেরা, দশ দিন হিন্দু দেবতা-পূজকেরা, এবং দশ দিন উলঙ্গ সন্ন্যাসীরা দান গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিশ দিন পর্যন্ত দরিদ্র নিরাশ্রয়, মাতাপিতৃহীন ও আত্মীয়স্বজনশূন্য ব্যক্তিদিগকে ধন দান করা হইত। সমুদয়ে পঁচাত্তর দিন পর্যন্ত উৎসবের কার্য চলিত। শেষদিনে মহারাজ শিলাদিত্য আপনার বহুমূল্য পরিচ্ছদ, মণিমুক্তা-খচিত স্বর্ণাভরণ, অত্যুজ্জ্বল মুক্তাহার প্রভৃতি সমুদয় অলংকার পরিত্যাগপূর্বক চীরশোভী বৌদ্ধ ভিক্ষুর বেশ পরিগ্রহ করিতেন। এই মহামূল্য আভরণরাশিও দরিদ্রদিগকে দান করা হইত। চীর ধারণ করিয়া মহারাজ শিলাদিত্য জোড় হাতে গম্ভীর স্বরে কহিতেন, “আজ আমার সম্পত্তিরক্ষার সমুদায় চিন্তার অবসান হইল। এই সন্তোষক্ষেত্রে আজ আমি সমুদায় দান করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। মানবের অভীষ্ট পুণ্য-সঞ্চয়ের মানসে ভবিষ্যতেও আমি এইরূপ দান করিবার জন্য আমার সমস্ত সম্পত্তি রাশীকৃত করিয়া রাখিব।’ এইরূপে পবিত্র প্রয়াগে সন্তোষক্ষেত্রের উৎসব পরিসমাপ্ত হইত। মহারাজ মুক্তহস্তে প্রায় সমস্তই দান করিতেন। কেবল রাজ্য-রক্ষা ও বিদ্রোহ-দমন জন্য হস্তী, ঘোটক ও অস্ত্রাদি অবশিষ্ট থাকিত।

সাধনা, চৈত্র, ১২৯৮। নব্যভারত, চৈত্র, ১২৯৮

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ১৩

“পুরাতন ও নূতন’। লেখক মহাশয়ের বক্তব্য এই যে, নূতন আসে এবং পুরাতন যায়– কিন্তু হায়, বর্তমান প্রবন্ধে সেই বিশ্বব্যাপী নিয়নের কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। পদের পর পদ আসিতেছে, কিন্তু পুরাতন কথাও ঘুচে না নূতন কথাও জুটে না। কোনো কোনো মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন কথা ব্যতীত ভাবা অসম্ভব, সে কথা কত দূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু দেখা যাইতেছে আমরা কিছুমাত্র না ভাবিয়াও অনর্গল কথা কহিয়া যাইতে পারি। অনেক স্থলে কথা কীটের মতো অতি দ্রুতবেগে আপনার বংশবৃদ্ধি করিয়া চলে,ভাবের জন্য অপেক্ষা করে না। যদি একবার দৈবাৎ কলমের মুখে বাহির হইল– “নূতনের ধারে পুরাতন থাকে না’ অমনি তাহার পর আরম্ভ হইল “বৃক্ষে নূতন পত্রের উদ্‌গম হইলে পুরাতন পত্র খসিয়া পড়ে।’ তস্য পুত্র : “নূতন ফুল ফুটিতেছে দেখিলে পুরাতন ফুল ঝরিয়া পড়ে।’ তস্য পুত্র : “নবীন সূর্য উঠিতেছে দেখিলে চাঁদ পালায়।’ তস্য পুত্র : “নব বসন্ত আসিতেছে দেখিলে শীত অন্তর্ধান হয়।’ তস্য পুত্র : “নূতন বন্ধুর উদয়ে পুরাতন বন্ধু লজ্জায় মুখ নত করিয়া চলিয়া যায়।’ (মানবের সৌভাগ্যক্রমে পুরাতন বন্ধুর এরূপ অকারণ অতিলজ্জাশীলতা সচরাচর দেখা যায় না।) তস্য পুত্র : “নূতন বৎসর আসিতেছে দেখিয়া পুরাতন বৎসর থাকিবে কেন?’ অবশেষে “৯৯ উদয়ে ওই দেখো ৯৮ সাল কালের গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে।’ এতক্ষণে কারণটা পাওয়া গেল– নববর্ষ আসিয়াছে, অতএব সময়োচিত কতকগুলা বাক্যবিন্যাস অত্যাবশ্যক, অতএব প্রথা অনুসারে কালের গতি সম্বন্ধে উন্নতিজনক উপদেশ হতভাগ্য পাঠককে নতশিরে সহ্য করিতে হইবে। তাই “হ্রাসবৃদ্ধি’ কাহাকে বলে সেই অতি নূতন ও দুরূহ তত্ত্বটি সম্পাদক মহাশয় দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতে বসিয়াছেন, পাঠকেরাও অগত্যা কাঁচিয়া শিশু সাজিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিতেছেন– “হ্রাসবৃদ্ধির কথাটা বলিয়াছি তো আর-একটু ভালো করিয়া বলি। ছোটো ছেলেটি ক্রমাগতই বড়ো হইতেছে! কত ভাব, কত শিক্ষা, কত রূপ, কত শোভা, কত বুদ্ধি, কত প্রতিভা ক্রমে ক্রমে ফুটিতেছে। ক্রমাগত সে বাড়িতেছে। কাল সে যেরূপ ছিল, আজ আর

সেরূপ নয়। বাড়িতে বাড়িতে যখন সে বার্ধক্যে উপস্থিত, তখন আবার তাহার সব হ্রাস হইতে লাগিল। সৌন্দর্য ডুবিতেছে, বুদ্ধি কমিতেছে, স্মৃতি লোপ পাইতেছে। দন্ত নড়িল, চর্ম শিথিল হইল, কালো চুল পাকিল, সে ক্রমে ক্রমে আরও পুরাতন, আরও পুরাতন হইতে লাগিল। শেষে নবীনের পার্শ্বে আর দাঁড়াইতে না পারিয়া, নবীনকে সকল সম্পদ ছাড়িয়া দিয়া, লজ্জায় মুখ নত করিয়া মরণকে চুম্বন করিল। নূতন আসিল পুরাতন সরিল।'– ছোটো ছেলেটি যে ক্রমে বড়ো হয় এবং তাহার বুদ্ধিও বাড়ে এ কথা সম্পাদক মহাশয় স্পষ্ট বুঝিয়াছেন ও বুঝাইয়াছেন– কিন্তু তাঁহার পাঠকদের সম্বন্ধে কি এ নিয়ম খাটে না? তাহারা যদি যথেষ্ট বড়ো হইয়া থাকে সেইসঙ্গে তাহাদের বুদ্ধি বিকাশ কি হয় নাই? এরূপ লেখা পড়িতে পড়িতে অবশেষে লেখকের অদ্ভুত সংযমশক্তি দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়। লেখক যে বিস্তর কথা জোটাইতে পারেন ক্রমে সেটা আর তেমন আশ্চর্য বোধ হয় না; কিন্তু অবশেষে তাঁহাকেও যে একটা জায়গায় আসিয়া থামিতে হয় সেইটেই বিস্ময় এবং আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উৎপাদন করে। এ কথা দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে অবাধে বাক্য সৃষ্টি করিয়া যাওয়া এবং অবসর পাইলেই পুরাতন উপদেশের ঝুলি খুলিয়া বসা ব্রাহ্মদের অত্যন্ত অভ্যস্ত হইয়াছে।– “মামলায় মরণ’। মামলা-মোকদ্দমা ম্যালেরিয়া প্রভৃতি মড়কের ন্যায় আমাদের দেশে ব্যাপ্ত হইয়া কীরূপ সর্বনাশের উপক্রম করিয়াছে এই সুলিখিত প্রবন্ধটি পড়িলে হৃদয়ংগম হইবে। সকল ব্যাধিই আপন অনুকূল ক্ষেত্রে অতি শীঘ্র ফলবান হইয়া উঠে– সেই কারণে কূটবুদ্ধি বাঙালির ঘরে মামলা-মোকদ্দমার নিদারুণ প্রকোপ দেখা যাইতেছে। লেখক মহাশয় মামলার পরিবর্তে সালিশি নিষ্পত্তির পরামর্শ দিতেছেন। কিন্তু এ পরামর্শ কাহার কর্ণগোচর হইবে? দেশে এমন কয়টা মোকদ্দমা হয় যেখানে উভয় পক্ষই ন্যায্য নিষ্পত্তির প্রার্থী? অধিকাংশ স্থলেই, হয় দুই পক্ষেই নয় এক পক্ষে ফাঁকি দিতে চায়, সে অবস্থায় আদালতের মতো এমন সুবিধার জায়গা কোথায় পাওয়া যাইবে? মামলা তো একপ্রকার আইনসংগত জুয়াখেলা, অনেকটা দৈব এবং অনেকটা কৌশলের উপর জয়-পরাজয় নির্ভয় করে। সেই খেলার সর্বনাশী উত্তেজনায় যাহারা সর্বস্ব পর্যন্ত পণ করিয়া বসে তাহাদিগকে উপদেশবাক্যে কে নিবৃত্ত করিবে? তাহারা বেশ জানে, মোকদ্দমার ফলাফল দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ, কিন্তু

সেই তাহাদের পক্ষে প্রধান আকর্ষণ।- “মুক্তিফৌজের অদ্ভুত কীর্তি’ প্রবন্ধে জেনেরাল বুথ যে কীরূপ অসাধারণ উদ্যম, বুদ্ধি ও সহৃদয়তার সহিত পতিত-উদ্ধার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহা পাঠ করিয়া আর-কিছু না হউক আমাদের- বাঙালিদের- অত্যুগ্র আত্মাভিমান যদি ক্ষণকালের জন্য কিঞ্চিৎ হ্রাস হয় তো সেও পরম লাভ বলিতে হইবে।

সাধনা, বৈশাখ, ১২৯৯। নব্যভারত, বৈশাখ, ১২৯৯

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ১৪

“প্রভাবতী সম্ভাষণ’। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় রচিত এই প্রবন্ধটি পাঠ করিলে হৃদয় করুণারসে আর্দ্র না হইয়া থাকিতে পারে না। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা প্রভাবতীকে বিদ্যাসাগর মহাশয় অপত্যনির্বিশেষে ভালোবাসিতেন। তাহার অকালমৃত্যুতে একান্ত ব্যথিত হইয়া প্রভাবতীর স্মৃতি চিরজাগরূক রাখিবার জন্য তিনি এই প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার একটি অংশ উদ্‌ধৃত করিয়া দিই– লেখক মহাশয় প্রভাবতীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন– “আমি বাহিরের বারান্ডায় বসিয়া আছি; তুমি, বাড়ির ভিতরের নীচের ঘরের জানালায় দাঁড়াইয়া আমার সঙ্গে কথোপকথন করিতেছ। এমন সময়ে, শশী (রাজকৃষ্ণবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র) কৌতুক করিবার নিমিত্ত বলিল, “উনি আর তোমায় ভালো বাসবেন না।’ তুমি অমনি শিরশ্চালনপূর্বক, “ভালো বস্‌বি, ভালো বস্‌বি’ এই কথা আমায় বারংবার বলিতে লাগিলে। অন্যান্য দিন, আমি, ভালো বাসিব বলিয়া, অবিলম্বে তোমার শঙ্কা দূর করিতাম। সেদিন, সকলের অনুরোধে, আর ভালো বাসিব না, এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলাম; তুমিও, প্রতিবারেই, “না ভালো বস্‌বি’ এই কথা বলিতে লাগিলে। অবশেষে, আমায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ স্থির করিয়া, তুমি স্ফূর্তিহীন বদনে, “তুই ভালো বস্‌বিনি আমি ভালো বস্‌ব’ এই কথা, এরূপ মধুর স্বরভঙ্গি ও প্রভূত স্নেহরসসহকারে বলিয়া বিরত হইলে, যে তদ্দর্শনে সন্নিহিত ব্যক্তি মাত্রেরই অন্তঃকরণ অননুভূতপূর্ব প্রীতিরসে পরিপূর্ণ হইল।’ –

“মহারাষ্ট্রীয় ভাষার প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব’ প্রবন্ধটি বিশেষ অবধানযোগ্য। “নূতন বাড়ি’ গল্পটি পড়িয়া আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না– প্রভু মহেন্দ্রনাথবাবুকে কৌশলে আপনার সহিত বিবাহবন্ধনে বাঁধিবার জন্য বাগানের মালীর বিধবা কন্যা যে এমনতর আজগবি ফন্দি খাটায় সে আমাদের কাছে নিতান্ত সৃষ্টিছাড়া ঠেকিয়াছে।

সাহিত্য, বৈশাখ, ১২৯৯

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ১৫

“লয়’। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পূর্ব পত্রিকাতেই বলিয়াছি। “প্রাইভেট্ টিউটার’।– পত্রের উত্তর-প্রত্যুত্তর অবলম্বন করিয়া একটি ছোটো গল্প। গল্পের উপসংহারটি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। আমাদের বরাবর ভয় ছিল পাছে সবশেষে, হয় এক্টা-দুটা আত্মহত্যা, নয় সমাজ-বিদ্রোহ, নয় কোনো রকমের একটা উৎকট কবিত্ব আসিয়া পড়ে। কিন্তু তাহা দূরে যাউক, লেখক এমতভাবে শেষ করিয়াছেন যে, নায়ক-নায়িকার প্রেমবৃত্তান্তটা অমূলক কি সমূলক পাঠকদের ধাঁধা লাগিয়া যায়। বিজয় তাঁহার শেষ পত্রে যে ভাবটুকু ব্যক্ত করিয়াছেন সাধারণত নব্য বঙ্গযুবকের পক্ষে তাহাই স্বাভাবিক– একদিকে হৃদয়ের টান, আর-এক দিকে উদরের টান, শেষোক্ত অঙ্গটির আকর্ষণশক্তিই কিঞ্চিৎ প্রবলতর– একটুখানি উপন্যাসের ধরনে প্রেমচর্চা করিবার দিকেও মন যায়, অথচ সেটা এত প্রকৃত এবং দৃঢ় নয় যে তাহার জন্য খুব বেশিমাত্রায় একটা বিপ্লব বাধাইতে পারে। ওটা একটা শখ মাত্র, কিন্তু শামলা বাঁধিয়া আপিসে যাওয়া বাঙালির পক্ষে নিতান্ত শখের নহে, ওইটেই জীবনের সর্বপ্রধান ঘটনা। বিজয়ের মনের ভাবটা মোটের উপরে একটু মিশ্রিত গোছের, না-এদিক না-ওদিক, বিশেষ কোনো রকমের নয়, যেমন সচরাচর হইয়া থাকে; অথচ এখনো তাহার মনে মনে একটু বিশ্বাস আছে সে কেবলমাত্র তুলা-হাটের কেরানি নহে, সে উপন্যাসের নায়ক– কিন্তু সেটা ভুল বিশ্বাস। “বৈদিক সোম। ৩য় প্রস্তাব’।– বেদে সোম অর্থে যে ঈশ্বরপ্রেম বুঝাইত লেখক মহাশয় তাহার আরও দুই-একটি নূতন দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন– পড়িয়া আমরা পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

সাধনা, জ্যৈষ্ঠ্য, ১২৯৯। সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ্য, ১২৯৯

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ১৬

"কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা'। লেখাটি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। বাংলায় এরূপ প্রবন্ধ প্রায় অত্যুক্তি এবং শূন্য হাহুতাশে পরিপূর্ণ থাকে– তাহার প্রধান কারণ, খাঁটি খবর আমরা পাই না, খাঁটি খবর আমরা চাইও না– মনে করি, খুব অলংকার দিয়া কেবল কতকগুলা ফাঁকা আবেগ প্রকাশ করিলে খুব উচ্চ অঙ্গের লেখা হয়। কোনো একটা আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত বেশ পরিষ্কার সহজভাবে লিপিবদ্ধ করিতে আমরা অক্ষম, সময়ে অসময়ে নিজের হৃদয়টাকে যেখানে-সেখানে টানিয়া আনিয়া তাহাকে খুব খানিকটা আস্ফালন বা অশ্রুপাত না করাইলে আমাদের কিছুতেই মনঃপূত হয় না। আমরা যে ভারি সহৃদয় কেবল এইটে প্রমাণ করিবার জন্যই যেন আমরা নানা ছুতো অন্বেষণ করিতেছি; সেইজন্য আসল কথাটা ভালো করিয়া বলিবার সুযোগ হয় না, মনে হয় ততক্ষণ নিজের হৃদয়টা প্রকাশ করিলে কাজে লাগিত। সহৃদয়তা করিতে, কাঁদুনি গাহিতে, বিস্মিত চকিত স্তম্ভিত হইতে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় না, অনুসন্ধান অথবা চিন্তার আবশ্যক করে না এবং লেখাটাও বিস্তার লাভ করে। নগেন্দ্রবাবুর লেখায় কাশ্মীরের বর্তমান অবস্থা এবং তদপেক্ষা ভাবী অবস্থা সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা জন্মাইয়া দেয়। "সমুদ্রযাত্রা ও জন্মভূমি পত্রিকা' – প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল, সরল ও নির্ভীক।

সাহিত্য, আষাঢ়, ১২৯৯

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ১৭

“মেঘনাদবধচিত্র’।– বহুকাল হইল প্রথম বর্ষের ভারতীতে। (শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ১২৮৪) মেঘনাদবধ কাব্যের এক দীর্ঘ সমালোচনা বাহির হইয়াছিল, লেখক মহাশয় এই প্রবন্ধে তাহার প্রতিবাদ প্রকাশ করিতেছেন। তিনি যদি জানিতেন ভারতীর সমালোচক তৎকালে একটি পঞ্চদশবর্ষীয় বালক ছিল তবে নিশ্চয়ই উক্ত লোকবিস্মৃত সমালোচনার বিস্তারিত প্রতিবাদ বাহুল্য বোধ করিতেন। – রিজ্‌লি সাহেবের নবপ্রকাশিত গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া ক্ষীরোদচন্দ্রবাবু “ব্রাক্ষণ্যধর্মের শ্রীবৃদ্ধি’ নামক যে প্রবন্ধ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে ভারতবর্ষের অনার্যজাতীয়েরা কী করিয়া ব্রাক্ষণ্যের গণ্ডির মধ্যে অল্পে অল্পে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়– প্রবন্ধটি নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হওয়ায় আমরা যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিলাম না।– “সাকার ও নিরাকার উপাসনা’। ইহাতে যে-সকল তর্ক অবলম্বিত হইয়াছে তাহা এতই সরল যে, সহসা মনে প্রশ্ন উদয় হয় এ-সকল কথা কি কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝানো আবশ্যক? দুঃখের বিষয় এই যে, আবশ্যক আছে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে যাঁহারা মনে মনে এ সমস্তই বুঝেন, তাঁহারাও নানারূপ কৃত্রিম কূট তর্ক উদ্‌ভাবন করিতেছেন, সুতরাং এ যুক্তিগুলি স্থলবিশেষে ভুল ভাঙিবার এবং স্থলবিশেষে কেবলমাত্র মুখবন্ধ করিবার জন্য আবশ্যক হইয়াছে।’ – “অনাহারে মরণ’। বাল্যকাল হইতে যথেষ্ট পুষ্টিকর আহার পায় না বলিয়া যে বাঙালি জাতির মনুষ্যত্ব অসম্পূর্ণ থাকে এ কথা আমরা লেখকের সহিত স্বীকার করি। শরীর অপুষ্ট থাকাতে আমাদের চরিত্রের ভিত্তি কাঁচা থাকিয়া যায়। লেখকের মতের সহিত আমাদের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে কেবল তাঁহার রচনার দুই-এক স্থলে আমাদের খটকা লাগিয়াছে। এক স্থলে আছে “তাঁহারা বাক্যসার, বক্তাদিগের অপেক্ষা ভালো স্বদেশপ্রেমিক “better patriots’।’ ইংরাজি কথাটা জুড়িয়া দিবার অত্যাবশ্যক কারণ বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধের উপসংহারে গদ্য সহসা বিনা নোটিসে একপ্রকার ভাঙাছন্দ পদ্যে পরিণত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য বুঝা কঠিন। সেইজন্য এই আড়ম্বরহীন গম্ভীর

প্রবন্ধ শেষকালটায় হঠাৎ এক অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে; সংযতবেশ ভদ্রলোক সভাস্থলে অকস্মাৎ নটের ভাব ধারণ করিলে যেমন হয় সেইরূপ। শেষ অংশটুকু বিচ্ছিন্ন করিয়া একটা স্বতন্ত্র পদ্য রচনা করিলে এরূপ খাপছাড়া হইত না।

সাধনা, শ্রাবণ, ১২৯৯। নব্যভারত, জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ়, ১২৯৯

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ১৮

“মধুচ্ছন্দার সোমযাগ’ ।– বেদে যে সোমযাগের উল্লেখ আছে এই অতি উপাদেয় প্রবন্ধে তাহারই আলোচনা উত্থাপিত হইয়াছে, লেখক মহাশয় বলেন বৈদিক ঋষিদের মধ্যে “মধুবিদ্যা’ নামক একটি গোপনীয় বিদ্যা ছিল। সেই বিদ্যার রহস্য যে জ্ঞানীরা অবগত ছিলেন তাঁহাদের নিকট মধু অর্থাৎ সোম অর্থে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মানন্দ। লেখক বলিতেছেন, “ঋগ্বেদের প্রথমেই মধুচ্ছন্দা নামক এক ঋষির কয়েকটি মন্ত্র আছে সেই মন্ত্রগুলির আদ্যন্ত আলোচনা করিলে, মধুচ্ছন্দার সোমযাগ কীরূপ ছিল, পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।’ এবারকার সংখ্যায়, মধুচ্ছন্দা ঋষি কে, তাহারই আলোচনা হইয়াছে। সোমযাগ কী তাহা জানিবার জন্য কৌতূহল রহিল। “উপাধি-উৎপাত’ প্রবন্ধে লেখক মনের আক্ষেপ তেজের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। যাঁহাদের আত্মসম্মান আপনাতেই পর্যাপ্ত, যাঁহারা রাজসম্মান চাহেন না, এমন-কি, প্রত্যাখ্যান করেন, তাঁহাদের মতো মানী লোক জগতে সর্বত্রই দুর্লভ। কিন্তু সাধারণত যাঁহারা রাজোপাধি লাভ করিয়া গৌরব অনুভব করেন তাঁহারা কি এতই তীব্র আক্রমণের যোগ্য! তাঁহাদের মধ্যে কি দেশের অনেক যথার্থ সারবান যোগ্য লোক নাই? উপাধি যদি স্থলবিশেষে অযোগ্য পাত্রে বর্ষিত হয় তবে সে রাজার দোষ– কিন্তু যাঁহারা রাজসম্মানের চিহ্নস্বরূপ উপাধি প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষলাভ করেন তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। কেবল রাজাদর কেন, পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় জনাদরও অনেক সময় যোগ্য পাত্রকে উপেক্ষা করিয়া অযোগ্য পাত্রে ন্যস্ত হয়, তাই বলিয়া জনাদর যে নিতান্তই অবজ্ঞার সামগ্রী তাহা বলিতে পারি না। সম্মান, আদর মনুষ্যের নিকট চিরকাল প্রিয়, মানুষের এ দুর্বলতার জন্য স্থলবিশেষে ঈষৎ হাস্যের উদ্রেক হইতে পারে কিন্তু এতটা তর্জন কিছু যেন বেশি হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বিশেষত, বঙ্কিমবাবু গবর্মেন্টের হস্ত হইতে রায় বাহাদুর উপাধি গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া লেখক যে আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমাদের নিকট নিতান্ত অযথা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, বঙ্কিমবাবু বঙ্গ দেশের দেশমান্য লেখক বলিয়া গর্বমেন্ট তাঁহাকে উপাধি দেন নাই– তিনি

গর্বমেন্টের পুরাতন কর্মচারী- তাঁহার যোগ্যতা ও কর্তব্যনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হইয়া গবর্মেন্ট যদি তাঁহাকে যথোচিত সম্মানচিহ্ন দান করেন তাহা অবজ্ঞা করিলে তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় কার্য হইত সন্দেহ নাই। বঙ্কিমবাবু দেশের জন্য যাহা করিয়াছেন দেশের লোক তজ্জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত উচ্চ আসন দিয়াছে- তিনি রাজার জন্য যাহা করিয়াছেন সে কাজ স্বতন্ত্র প্রকৃতির, তাহার পুরস্কারও স্বতন্ত্র শ্রেণীর- তাহার সহিত হৃদয়ের বিশেষ যোগ নাই, সে সমস্তই যথানির্দিষ্ট নিয়মানুগত – অতএব তাহা লইয়া ক্ষোভ করিতে বসা মিথ্যা। উপাধি লওয়া সম্বন্ধে কার্লাইল ও টেনিসনের সহিত বঙ্কিমবাবুর তুলনা ঠিক খাটে নাই। যাহা হউক, লেখাটি ভালো হইয়াছে সন্দেহ নাই। “বন্ধু’ গল্পটির মধ্যে পশ্চিমাঞ্চলের স্নিগ্ধ শ্রাবণ মাস বেশ একটি সংগীতমিশ্রিত সৌন্দর্য নিক্ষেপ করিয়াছে।– “আদর্শ সমালোচনা’। বোধ করি এমন ভাগ্যবান সমালোচক কখনো জন্মেন নাই যিনি আপন কর্তব্য কার্য সম্পন্ন করিয়া অক্ষত শরীরে পৃথিবী হইতে অপসৃত হইতে পারিয়াছেন। যখন উক্ত অপ্রিয় কর্তব্য স্কন্ধে লইয়াছি তখন আমরাও যে সহজে অব্যাহতি পাইব এমন দুরাশা আমাদের নাই। অতএব “আদর্শ-সমালোচনা’- লেখক যে গুপ্তভাবে আমাদের প্রতি বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন সেজন্য আমরা লেশমাত্র আশ্চর্য বা দুঃখিত হই নাই। দুঃখের বিষয় এই যে, লেখকের নিপুণতার আমরা প্রশংসা করিতে পারিলাম না। আমরা বন্ধুভাবে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে পারি যে, তিনি যদি রসিকতা প্রকাশের নিষ্ফল চেষ্টা না করিয়া অন্য কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন তো হয়তো কৃতকার্য হইতেও পারেন। “কালিদাস ও সেক্সপিয়র’ লেখার মধ্যে যথেষ্ট চিন্তাশীলতা আছে, আমরা ইহার পরিণামের জন্য অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। “আমার “স্বরচিত” লয়তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যাহা বক্তব্য তাহা সাহিত্যেই লিখিয়া পাঠাইয়াছি। এখানে কেবল সংক্ষেপে একটি কথা বলিয়া রাখি। আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ক্ষুদ্র অনুরাগ বৃহৎ অনুরাগে পরিণত হইতে পারে কিন্তু বৃহৎ অনুরাগ কী করিয়া নিরনুরাগে লইয়া যাইবে আমরা বুঝিতে পারি না। চন্দ্রনাথবাবু তাহার উত্তরে লিখিয়াছেন, ছোটো অনুরাগ যখন স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন বা বিপরীত প্রকৃতির বড়ো অনুরাগে পরিণত হইতেছে তখন বড়ো অনুরাগ নিরনুরাগে পরিণত হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়।

এক শক্তি ভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হইতে পারে বলিয়াই শক্তির ধ্বংস হওয়া আশ্চর্য নহে এরূপ যুক্তি আমরা প্রত্যাশা করি নাই। দেখিতেছি আমাদের আলোচনা ক্রমশ কথাকাটাকাটিতে পরিণত হইতেছে, অতএব এ আলোচনা এইখানেই লয় প্রাপ্ত হইলে মন্দ হয় না।

সাহিত্য, শ্রাবণ, ১২৯৯

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ১৯

সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা। প্রথম ভাগ। দ্বিতীয় সংখ্যা। শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত। বার্ষিক মূল্য তিন টাকা।

সাহিত্য পরিষদ সভা হইতে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। এই পত্রিকায় আমরা এমন সকল প্রবন্ধের প্রত্যাশা করি যাহাতে বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাস এবং বঙ্গভাষার পুরাবৃত্ত, ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব ও অভিধান রচনার সহায়তা করে। আমাদের দেশের প্রাচীন পুঁথির পাঠোদ্ধার এবং অপ্রচলিত পুরাতন শব্দের অর্থবিচারও ইহার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত এবং বাংলা রূপকথা (Folklore), প্রবচন (Proverb), হরুঠাকুর, রামবসু প্রভৃতি লোকপ্রসিদ্ধ কবিওয়ালাদিগের গান, ছড়া (nursery-rhyme) প্রভৃতি সংগ্রহের প্রতিও ইহার দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। বর্তমান-সংখ্যক পত্রিকাটি দেখিয়া আমরা কিয়ৎপরিমাণে আশান্বিত হইয়াছি। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত লিখিত কৃত্তিবাস এবং শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী লিখিত বৈজ্ঞানিক পরিভাষা পরিষদ-পত্রিকার সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সাধারণের সমাদরযোগ্য হইয়াছে। কিন্তু আমরা দুঃখের সহিত বলিতেছি সম্পাদক-লিখিত ঁভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধটির মধ্যে কেবল যে-সকল ছত্র ভূদেববাবুর গ্রন্থ হইতে উদধৃত সেই অংশগুলিই পাঠ্য এবং অবশিষ্ট সমস্তই অপ্রাসঙ্গিক ও অনাবশ্যক বাগাড়ম্বরে পরিপূর্ণ। আমরা লেখক মহাশয়ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া প্রবন্ধের একটি অংশ উদ্‌ধৃত করি :

“মিল্টন যখন কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, তখন ভয়াবহ বিপ্লবে সমগ্র ইংলন্ড আন্দোলিত হইয়াছিল। তখন স্বাধীনতার সহিত যথেচ্ছাচারের ভীষণ সংগ্রাম ঘটিয়াছিল। এই সংগ্রাম একদিনে পর্যবসিত হয় নাই; একস্থানে এই সংগ্রামস্রোত অবরুদ্ধ হইয়া থাকে নাই, এক সম্প্রদায় এই সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করে নাই। এই সংগ্রামে ইংরেজ জাতির যেরূপ স্বাধীনতা লাভ হয়, সেইরূপ আমেরিকার আরণ্যপ্রদেশ সুদৃশ্য নগরাবলীতে শোভিত হইতে থাকে। অন্য দিকে গ্রীস দুইহাজার বৎসরের অধীনতাশৃঙ্খল ভগ্ন করিতে

উদ্যত হইয়া উঠে। এই দীর্ঘকালব্যাপী সমরে য়ুরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত এরূপ প্রচণ্ড বহ্নিস্তূপের আবির্ভাব হয় যে, উহার জ্বালাময়ী শিখা প্রত্যেক নিপীড়িত ও নিগৃহীত ব্যক্তির হৃদয়ে উদ্দীপিত হইয়া তাহাদিগকে দীর্ঘকালের নিপীড়ন ও নিগ্রহের গতিরোধে শক্তিসম্পন্ন করে।’

পাঠকেরা মনে করিতে পারেন ভূদেব মুখোপাধ্যায় য়ুরোপের এই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তব্যাপী জ্বালাময়ী শিখার কিয়দংশ কোনো উপায়ে আহরণ করিয়া এই বাঙালি লেখকের ভাষায় ও কল্পনায় বর্তমান অগ্নিদাহ উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু লেখক বলিতেছেন- তাহা নহে।’ “ভূদেবের সময় হিন্দুসমাজে যে বিপ্লব উপস্থিত হয়, তাহা মিল্টনের সময়ের বিপ্লবের ন্যায় সর্বত্র ভীষণ ভাবের বিকাশ করে নাই; উহাতে নরশোণিতস্রোত প্রবাহিত হয় নাই; প্রজালোকের সমক্ষে দেশাধিপতির শিরশ্ছেদন ঘটে নাই বা জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য উত্তেজিত হইয়া ভয়ংকর কার্যসাধনে আত্মোৎসর্গ করে নাই।’

বিস্তারিতভাবে এমন হাস্যকর তুলনার অবতারণ এবং অবশেষে একে একে তাহার আদ্যন্ত খণ্ডন কোনো দেশের কোনো প্রহসনেও এ পর্যন্ত স্থান পায় নাই। গ্রন্থকার কুরুক্ষেত্রের সমস্ত যুদ্ধবর্ণনা মহাভারত হইতে আদ্যোপান্ত উদ্‌ধৃত করিয়া সর্বশেষে লিখিতে পারিতেন যে, ভূদেবের সময় যদিচ “নবীন ভাবের বাহ্যবিভ্রমে পুরাতন ভাবের স্থিতিশীলতা কিয়ৎপরিমাণে বিচলিত ‘ হইয়াছিল, যদিচ “তখন ইংরেজি ভাবের প্রচার ও ইংরেজি শিক্ষা বদ্ধমূল হইয়াছিল’ এবং “বিজ্ঞানের কৌশলে ভারতবর্ষ যেন ইংলণ্ডের দ্বারস্থ হইয়া উঠিয়াছিল’ কিন্তু ঘটোৎকচবধ হয় নাই।

সাহিত্য পরিষদ সভার প্রতি আমাদের আন্তরিক মমতা আছে বলিয়া এবং তাহার নিকট হইতে আমরা অনেক প্রত্যাশা করি বলিয়াই সাধারণের সমক্ষে তাহার এরূপ অদ্ভুত বাল্যলীলা আমাদের নিকট নিরতিশয় লজ্জা ও কষ্টের কারণ হয়।

সাধনা, ভাদ্র-আশ্বিন, ১২৯৯

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ২০

“লাল পল্টন’ ঐতিহাসিক প্রবন্ধটি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের রচনা। বিষয় এবং লেখকের নাম শুনিলেই পাঠকদের সন্দেহ থাকিবে না যে প্রবন্ধটি সর্বাংশেই পাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু আমাদের একটি কথা বক্তব্য আছে। প্রবন্ধটি দীর্ঘ এবং গত দুই-তিনবারের অনুবৃত্তি। আমাদের বিবেচনায় ধারাবাহিকরূপে গ্রন্থ প্রকাশ সাময়িক পত্রের উদ্দেশ্য নহে। সাময়িক পত্রে বিচিত্র খণ্ড প্রবন্ধ এবং সাময়িক বিষয়ের আলোচনায় পাঠকের চিত্তকে নানা দিকে সজাগ করিয়া রাখে। কোনো শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট বিস্তৃত বিষয়কে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করা স্বভাবতই ইহার কাজ নহে। কারণ, বৃহৎ বিষয় অখণ্ড মনোযোগের দাবি রাখে, একক-সমগ্রতাই তাহার প্রধান গৌরব, নানা বিচিত্র বিষয়ের মাঝখানে তাহাকে টুকরা করিয়া বসাইয়া দেওয়া অসংগত। এইরূপে গৌরববান রচনাও তাহার লঘুপক্ষ সঙ্গীদের দ্রুতগামী জনতার মধ্যে পাঠকদের মনোযোগ হইতে ক্রমশই দূরে পিছাইয়া পড়িতে থাকে এবং কথঞ্চিৎ অবজ্ঞার বিষয় হইয়া উঠে। ক্ষমতাসম্পন্ন লেখকদের লেখার এরূপ দুর্গতিসম্ভাবনা আমাদের নিকট অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিয়া মনে হয়। যাহাই হৌক, বৃহৎ গ্রন্থ এবং সাময়িক পত্রের মধ্যে একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকা কর্তব্য। “বিজ্ঞান বা প্রকৃতির ইচ্ছা’– আমরা এরূপ গদ্য রচনার পক্ষপাতী নহি। ইহার মধ্যে ভাবুকতার চেষ্টা এবং চিন্তাশীলতার আড়ম্বর আছে কিন্তু আসল জিনিসটুকু নাই। “বৃহস্পতির কলঙ্ক’ সরল, সরস এবং কৌতুকাবহ। ধূমকেতুর সংঘর্ষে পৃথিবীর যে কী বিভ্রাট ঘটিতে পারে সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ফ্লামারিয়ঁ তাঁহার “পৃথিবীর সংহার’ নামক ফরাসি উপন্যাস গ্রন্থে তাহা সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। সৌরজগতের বিপুলতম গ্রহ বৃহস্পতি ধূমকেতুর কেশাকর্ষণ করিয়া তাহাকে কীরূপে আপন অন্তঃপুরসাৎ করিয়াছেন অপূর্ববাবু সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা করিয়াছেন, আমাদের অবলা পৃথিবী উন্মাদ ধূমকেতুকে সেরূপ নিরাপদে আয়ত্ত করিতে পারে কি না সন্দেহ। “চুলকাটা মিষ্‌মী’ সচিত্র প্রবন্ধটি সুপাঠ্য। “শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি’ উপন্যাসটি সংক্ষিপ্ত স্বভাবসংগত এবং সুরচিত

হইয়াছে। সুবিখ্যাত মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের সচিত্র যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বাহির হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। ভারতবর্ষীয় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের মহাত্মাগণের সহিত আমাদের পরিচয় সাধন নানা কারণে শ্রেয়স্কর।

সাধনা, পৌষ, ১৩০১। প্রদীপ, বৈশাখ, ১৩০০

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ২১

অক্ষয়বাবুর “লাল-পল্টন’ কে যখন সাময়িক পত্রের অধিকার হইতে পরাহত করিবার চেষ্টা করিয়াছি তখন উৎসাহে প্রকাশিত তাঁহার “অজ্ঞেয়বাদ’কে কোনোমতে আমল দিতে পারি না। বিষয়টি দুরূহ এবং ইহার যুক্তিগুলি পরস্পরসাপেক্ষ, এমত অবস্থায় ইহাকে ছিন্ন ছিন্ন করিয়া প্রকাশ করিলে প্রবন্ধের দুরূহতা বাড়িয়া যায় অথচ তাহার যুক্তির সংযত বল খণ্ডীকৃত হয়। লেখাটি এই খণ্ডেই সম্পূর্ণ হইয়াছে এক্ষণে গ্রন্থাকারে ইহার সহিত যথাযোগ্য সম্ভাষণের প্রত্যাশায় রহিলাম। শ্রীযুক্তবাবু রজনীকান্ত চক্রবর্তী “শ্রীকৃষ্ণ লীলামৃত’ নামক দুইশত বৎসরের একটি প্রাচীন বৈষ্ণব কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীযুক্তবাবু শশধর রায় “বর্ণ’ প্রবন্ধে মনুষ্য-ত্বকের বর্ণোৎপত্তির কারণ আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকদের বোধ হয়, এবং লেখকও স্বীকার করিয়াছেন, প্রবন্ধ-ধৃত মত পরীক্ষা ও প্রমাণের অপেক্ষা রাখে। “ভৌতিক নোট’ গল্পটি সুনিপুণ। ছোটো কথা, আকারে অতি ছোটো এবং উপদেশে অত্যন্ত বড়ো বটে কিন্তু বিষয়ে অতিশয় পুরাতন এইজন্য রচনার বিশেষরূপ নৈপুণ্য না থাকায় তাহা নিরর্থক। “উকিল কলঙ্ক’ -নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখক ব্যঙ্গচ্ছলে ওকালতি করিয়াছেন; সব শেষে তাহাতে এই কথাটা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন যে, নীতি-উপদেষ্টাগণ নিজের হাতে ধর্মনীতির যে সোজা সোজা চক-কাটা ঘর বানাইয়াছেন, বিচিত্র মনুষ্য-চরিত্র তাহার মধ্যে সঞ্চরণ করিতে পারে না এবং জোর করিয়া চালনা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠে।

উৎসাহ, ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩০৪

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ২২

"কি চাই কি পাই?' প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা সম্পাদকের জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছি। দোষদুর্বলতা আমাদের সকলেরই আছে এবং এই মাটির পৃথিবীতে দোষগুণে জড়িত আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবদিগকে লইয়া আমরা কোনোপ্রকারে সন্তোষ অবলম্বন করিয়া আছি। কিন্তু নব্যভারতের ষোড়শবার্ষিক জন্মদিনে সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন "পঞ্চদশ বর্ষ আমি কেবল আদর্শ খুঁজিতেছি।' মূঢ়সাধারণে ভুল করিত তিনি কেবল তাঁহার মাসিক পত্রের জন্য গ্রাহক ও লেখক খুঁজিতেছেন। কিন্তু লেখক বলেন "সাহিত্যের সেবা আমার কেবল কথার কথা, উপলক্ষ মাত্র; আমি লোক খুঁজিয়া লোক ধরিয়া কেবল অন্তর পরীক্ষা করিতেছি। পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, এমন লোক সম্মুখে পড়ে নাই, যিনি পরের সেবা করিতে করিতে আপনার স্বার্থ ভুলিয়াছেন, যিনি অম্লান চিত্তে দেশের জন্যে সর্বস্ব বিসর্জন দিতে পারিয়াছেন– যিনি চরিত্রে অটল, পুণ্য পবিত্রতায় উজ্জ্বল, যিনি দ্বেষহিংসা পরশ্রীকাতরতাহীন, যিনি পূর্ণাদর্শ।' এইরূপে অনাহূত পরকে যাচাই করিয়া বেড়াইবার অনাবশ্যক কার্যভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া পরীক্ষক মহাশয় এতই কষ্ট পাইতেছেন যে, আপন নাট্যমঞ্চের উপর চড়িয়া বসিয়া সকলকে বলিতেছেন "কাতরে পা ধরিয়া প্রার্থনা করিতেছি ঘৃণা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া আমার সম্মুখে আদর্শ রূপে দাঁড়াও।' তাঁহার কাতরতা দেখিয়া বিচলিত হইতে হয় কিন্তু "ঘৃণালজ্জা' ত্যাগ করা সহজ নহে। এমন-কি, তিনিও তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। বর্তমান প্রবন্ধে আদর্শরূপে দাঁড়াইতে গিয়া তিনিও স্থানে স্থানে পরমসাধুতাসম্মত বিনয়ের আবরণ রাখিয়াছেন; তিনিও বলিয়াছেন "আমি পতিত,মলিন, পাপে জর্জরিত– আমি অসারের অসারে মণ্ডিত– ঘৃণিত, মলিন। পরিত্যক্ত, নির্যিত, লাঞ্ছিত হওয়াই আমার পক্ষে সাজে ভালো।' বিনয়ের সাধারণ অত্যুক্তিগুলিকে কেহ কখনো সত্য বলিয়া গ্রহণ করে না– সম্পাদক মহাশয়ও সেরূপ আশঙ্কা করেন নি। যদিবা আশঙ্কা থাকে লেখক তাহার প্রচুর প্রতিকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "স্বার্থ ভুলিয়া পরার্থ, নীচত্ব ভুলিয়া মহত্ত্ব, পশুত্ব ভুলিয়া চিন্ময়ত্ব, রিপুর

উত্তেজনা ভুলিয়া সংযম পাইব আশায়, তোমার আহ্বানে, আমি কাঙাল, স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যের মুকুট মস্তকে বহিয়া, আত্মীয়দিগের মায়ামমতায় ছাই ঢালিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিলাম!' ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর দুটি-চারটি আছে মাত্র এবং সেই ক্ষণজন্মা আদর্শ পুরুষদের ন্যায় আমাদের সম্পাদক মহাশয়ও কাঙাল, এবং তিনিও মায়ামমতায় ছাই ঢালিয়া ছুটিয়া আসেন। কিন্তু এ কথাটিও ভুলিতে পারেন নাই যে, যে দারিদ্র্য তিনি মস্তকে বহিয়াছেন তাহা "মুকুট'– এবং সেই মুকুট নাড়া দিয়া তিনি অদ্য আমাদের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিতে আসিয়াছেন। ক্রমে যতই উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহার লজ্জা ততই ঘুচিয়াছে– সকলকে ধিক্‌কার দিয়া বলিয়াছেন "সাধে কি আমি নৈরাশ্যের আগুন জ্বালিয়া ভস্ম হইতে বসিয়াছি! পিতামাতার স্নেহের বন্ধন যাহার ছিন্ন, সে যে ভালোবাসার কত কাঙাল, তাহা তুমি, ঐশ্বর্যের দাসানুদাস, কী বুঝিবে? আমি ভালোবাসার কাঙাল, কিন্তু ভালোবাসাকেও তুচ্ছ করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়াছি, দেবত্বের আকর্ষণে।' সম্পাদক মহাশয়কে আমরা কেহই বুঝিতে পারি নাই– কারণ আমরা ঐশ্বর্যের দাসানুদাস এবং তাঁহার মহীয়ান্ মস্তকে দারিদ্র্যের মুকুট; কিন্তু এমনি করিয়া যদি মধ্যে মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে নিজেই বুঝাইতে শুরু করেন তাহা হইলে না বুঝিয়া আমাদের উপায় থাকিবে না। "দেবত্বের আকর্ষণে' তিনি আমাদিগকে ছাড়াইয়া যে কতদূর পর্যন্ত পৌঁছিয়াছেন তাহা লিখিয়াছেন– "আদর্শ ভুলিয়া আমি জটিল, কুটিল, মলিন, অপবিত্র ভালোবাসা বা একতা চাহি না। যদি তাহারই কাঙাল হইতাম, যাহাদের সহিত রক্তের সংস্রব ছিল তাঁহাদের স্নেহ ভুলিতাম না। তাঁহাদের স্নেহডোর ছিন্ন করিয়া দূরে দূরে, বিদেশে বিদেশে, নির্জনে নির্জনে, একাকিত্বের রাজ্যে কাঙালের ন্যায় বেড়াইতাম না!' কিন্তু এ কথা কেহ মনে করিয়ো না, নব্যভারতের সম্পাদক হওয়ার পর হইতে অদ্য পঞ্চদশ বৎসর ইহাঁর এই দশা! বাল্যকালে সুলক্ষণগুলি ছিল লেখক সে আভাস দিতে ছাড়েন নাই। "আদর্শহীনতার জন্য বাল্যকাল হইতে কতজনের স্নেহডোর ছিঁড়িয়াছি; যত লোকের নিকট গিয়াছি, যখনই তাঁহাদের মধ্যে আদর্শহীনতা দেখিয়াছি, তখনই ছুটিয়া পলাইয়াছি। সেজন্য তাঁহারা আমার প্রতি আজ কত বিরক্ত! সেজন্য তাঁহারা কত ক্রোধান্বিত!!' আমাদের সহিত কত প্রভেদ! আমরা যখন ইস্কুল পলাইতাম, আমাদের সম্পাদক মহাশয় সেই বয়সে

“আদর্শহীনতা’ হইতে পলায়ন করিতেন। মাস্টার আমাদের প্রতি রাগ করিতেন কিন্তু তাঁহার প্রতি ক্রোধান্বিত হইত জগতের সমস্ত আদর্শহীন ব্যক্তিরা! ভাবিয়া দেখো, সেই বালকটি বড়ো হইয়াছে এবং আজ লিখিতেছে “চাহিয়াছি সত্য, পাইয়াছি মিথ্যা; চাহিয়াছি পুণ্য, পাইয়াছি পাপ; চাহিয়াছি স্বর্গ, পাইয়াছি নরক; চাহিয়াছি আন্তরিকতা, পাইয়াছি বাহ্যাড়ম্বর; চাহিয়াছি দেবত্ব, পাইয়াছি পশুত্ব; চাহিয়াছি সাত্ত্বিকতা, পাইয়াছি রাজসিকতা; চাহিয়াছি অমরত্ব, পাইয়াছি নশ্বরত্ব। কী তীব্র অভিজ্ঞতা!!’ মহাপুরুষকে মিনতি করি তিনি শান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, ভাষাকে সংযত করুন, পৃথিবীকে ক্ষমা করুন, পাঠকদিগের প্রতি দয়া করুন, তাঁহার নববর্ষ-নাট্যশালার কৃত্রিম বজ্রটিকে প্রতিসংহার করিয়া লউন! তিনি যে সত্য চাহিয়াছিলেন সে গৌরব তাঁহারই থাক্ এবং যে মিথ্যা পাইয়াছেন সে লাঞ্ছনা আর সকলে বহন করিবে; তিনি যে পুণ্য চাহিয়া ফিরিয়াছিলেন সে দুর্বিষহ সাধুতা তাঁহাতেই বর্তিবে, এবং যে পাপ পাইয়াছেন সে অক্ষয় কলঙ্ক অপর সাধারণের ললাটে আঁকিয়া দিন; তিনি স্বর্গীয় তাই স্বর্গ চাহিয়াছিলেন কিন্তু নরক পাইয়াছেন সে হয়তো তাঁহারই আত্মদোষে নহে; তিনি অকপট তাই চাহিয়াছিলেন আন্তরিকতা কিন্তু বাহ্যাড়ম্বরটা– সে আর কী বলিব! পরন্তু বর্তমান প্রবন্ধে তিনি যেরূপ আদর্শ হইয়া উঠিয়াছেন, পায়ে ধরিয়া প্রার্থনা করিলেও সকলে তেমনটি হইতে পারিবে না, কারণ, “ঘৃণালজ্জা’ একেবারেই পরিত্যাগ করা বড়ো কঠিন!

এই প্রসঙ্গে সম্পাদকের নিকট আমাদের একটি মিনতি আছে। যদিও তাঁহার হৃদয়োচ্ছ্বাস সাধারণের অপেক্ষা অনেক বেশি তথাপি বিস্ময়সূচক বা প্রবলতাসূচক তিলকচিহ্নগুলি (!) স্থানে স্থানে দ্বিগুণীকৃত করিয়া কোনো লাভ নাই। উহাকে লেখার মুদ্রাদোষ বলা যাইতে পারে। এ প্রকার চিহ্নকে একাধিক করিয়া তুলিলে কোথাও তাহার সীমা স্থাপন করা যায় না। ভাবিয়া দেখুন কোনো একটি নব্যতর-ভারত সম্পাদকের হৃদয়োচ্ছ্বাস যদি দুর্দৈবক্রমে দ্বিগুণতর হয় তবে তিনি “কী তীব্র অভিজ্ঞতা’ লিখিয়া তাহার পশ্চাতে চারটি !!!! তিলক চিহ্ন বসাইতে পারেন– এবং এইরূপ রোখ চড়িয়া গেলে ক্রমে ভাষার অপেক্ষা ইঙ্গিতের উপদ্রব বাড়িয়া চলিবে। এ কথা সম্পাদক মহাশয় নিশ্চয়

জানিবেন, তাঁহার ভাষাই যথেষ্ট, তাঁহার ভঙ্গিমাও সামান্য নহে, তাহার পরে যদি আবার মুদ্রাদোষ যোগ করিয়া দেন, তবে তাহা সাধারণ লোকের পক্ষে কিছু অধিক হইয়া পড়ে।

ভারতী, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৫। নব্যভারত, বৈশাখ, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ২৩

"নবদ্বীপ' কবিতা শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রচিত। কবিতাটি একদিকে সহজ এবং ব্যাঙ্গোক্তিপূর্ণ অপর দিকে গম্ভীর এবং ভক্তিরসার্দ্র; একত্রে এরূপ অপূর্ব সম্মিলন যেমন দুরূহ তেমনি হৃদয়গ্রাহী। ইহাতে ভাষা ছন্দ এবং মিলের প্রতি কবির অনায়াস অধিকার পদে পদে সপ্রমাণ হইয়াছে। শ্রীমতী কৃষ্ণভাবিনী দাস "আজকালকার ছেলেরা' শীর্ষক যে ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বিশেষ শ্রদ্ধা ও মনোযোগ সহকারে পাঠ্য। ছাত্রদের স্বভাব ও শিক্ষা ক্রমশ যে হীনতা পাইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই; লেখিকার মতে তাহার একটি কারণ, আজকাল বিদ্যাদান দোকানদারিতে পরিণত হইয়াছে এবং ছাত্রদিগকে হস্তগত রাখিবার জন্য স্কুলের কর্তৃপক্ষদিগকে সর্বপ্রকার শাসন শিথিল করিতে হইয়াছে। ইহা ছাড়া, আমাদের বিশ্বাস, পরীক্ষার উত্তেজনা, পাঠ্যগ্রন্থের পরিমাণ, কী-পুস্তকের প্রচার এবং প্রাইভেট স্কুলগুলির প্রতিযোগিতায় মুখস্থ শিক্ষা ক্রমেই প্রবল বেগে বাড়িয়া উঠিয়াছে; পাঠ্যগ্রন্থ হইতে নব নব সরস ভাব গ্রহণের দ্বারা বালকদের হৃদয় স্বতই যে উপায়ে জাগ্রত হইয়া উচ্চ আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয় এখন তাহা যেন প্রতিরুদ্ধ হইতেছে; এখন কেবল কথা ও কথার মানে, শিক্ষার সমস্ত শুষ্ক ধূলিরাশি, তাহাদের চিত্তকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। "ওয়েল্‌স্‌-কাহিনী' প্রবন্ধে লেখক দেখাইয়াছেন, ওয়েলস্‌ ভাষা ইংরাজি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং সেখানকার অধিবাসীগণ স্বপ্রদেশের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত। কিন্তু আমরা বলিতেছি তৎসত্ত্বেও যদি তাহারা দায়ে পড়িয়া ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যকে গ্রহণপূর্বক ইংরাজের সহিত এক হইয়া না যাইত তবে সংকীর্ণ প্রাদেশিকতার হস্ত এড়াইয়া তাহারা কখনোই জাতিমহত্ত্ব লাভ করিতে পারিত না। আমাদের দেশের উড়িয়া, আসামি ও বেহারিগণ যদি সামান্য অন্তরায়গুলি নষ্ট করিয়া ভাষা ও সাহিত্যসূত্রে বাঙালির সহিত মিশিতে পারে তবে বাঙালি জাতির অভ্যুত্থান আশাজনক হইয়া উঠে। "সার্‌ সৈয়দ আহমদ খাঁর' সচিত্র জীবনী পাঠ করিলে আমরা একটি অকৃত্রিম মহৎ জীবনের আদর্শ

লাভ করিতে পারি। আলিগড়ে যেরূপ কলেজ তিনি স্থাপন করিয়াছেন সেইরূপ ছাত্রনিবাসসহ-কৃত একটি কলেজ বাংলাদেশে স্থাপিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়াছে।

প্রদীপ, জৈষ্ঠ্য, ১৩০৪

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ২৪

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের “পুণ্যাহ’ প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র, মনোরম এবং কৌতুকাবহ হইয়াছে। অক্ষয়বাবু সেকালের মুসলমানরাজত্বের একটি অদৃশ্য বিস্মৃত ক্ষুদ্র কোণের উপর একটি ছোটো বাতি জ্বালিয়া ধরিয়াছেন এবং পাঠকের কল্পনাবৃত্তিকে ক্ষণকালের জন্য তৎকালীন ইতিহাসরহস্যের প্রতি উৎসুক করিয়া তুলিয়াছেন। “জগৎশেঠ’ প্রবন্ধটি সুলিখিত সারবান। কিছুকাল পূর্বে বাংলা সাময়িক পত্রে পুরাতত্ত্বঘটিত প্রবন্ধগুলি যেরূপ শুষ্ক, তর্কবহুল ও নোট-জালে জড়ীভূত জটিল ছিল অক্ষয়বাবু-নিখিলবাবুর ন্যায় লেখকদের প্রসাদে সে দশা ঘুচিয়া গেছে এবং বাংলা ইতিহাসের শুষ্ক তরু পল্লবিত মঞ্জরিত হইবার উপক্রম করিয়াছে। “সে দেশে’ শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের রচিত একটি কবিতা। কবিতা সমালোচনা করিতে আমরা সংকোচ বোধ করি কিন্তু এ স্থলে না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না যে, এই আটটি শ্লোকের কবিতাকে চারিটি শ্লোকে পরিণত করিলে ইহার গীতিরসমাধুর্য সুন্দর সুসম্পূর্ণ হইয়া উঠে- ইহার জোড়া জোড়া শ্লোকের দ্বিতীয় শ্লোকগুলি বাহুল্য, এবং তাহারা অতিবিস্তারে ভাবের গাঢ়তা হ্রাস করিয়াছে। আমরা নিম্নে এই মধুর কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ দিলাম : –

সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।
সে দেশে সরলা আছে, তাই ফুল ফোটে গাছে,
কোকিল কুহরি উঠে, কথা যদি কয়।
সে দেশে বসন্ত নাই, নাহি এ মলয়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।
সরলা আছে সে দেশে, তারি নীল কালো কেশে,
খেলে প্রেম ইন্দ্রধনুঃ চারু শোভাময়।
সে দেশে বরষা নাই, নাহি মেঘচয়।
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীতভয়।

সে দেশে সরলা হাসে, জ্যোছনা তা নীলাকাশে,
স্থলে তাহা স্থলপদ্ম, জলে কুবলয়।
সে দেশে শরৎ নাই, নাহি শীত ভয়।
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়।
সে দেশে সরলা আছে, রবি শশী তারি কাছে,
ঘোমটার তলে হাসে, একত্র উভয়।
সে দেশে দিবস নাই, নিশা নাহি হয়।

হেমেন্দ্রপ্রসাদবাবু “রমণীর অধিকার’ প্রবন্ধে যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে তাঁহার সহিত আমাদের মতের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে; কিন্তু যাহাদের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য নাই তাহাদিগকে পরাভূত করিবার উপযোগী যুক্তি ও প্রমাণবিন্যাস এই ক্ষুদ্রপরিসর প্রবন্ধে সম্ভবপর হইতে পারে না। “হেমের অনধিকার’ নামক গল্পে স্ত্রীবিয়োগবিধুর উদ্‌ভ্রান্ত বিলাপকারীদের প্রতি করুণরসমিশ্রিত একটি নিগূঢ় বিদ্রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। অসংযত হৃদয়োচ্ছ্বাসের মধ্যে যে একটি গোপন অলীকতা আছে লেখক সংক্ষেপে তাহার আভাস দিয়াছেন।

উৎসাহ, বৈশাখ, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ২৫

এই নূতন পত্রের অধিকাংশ গদ্য ও পদ্য প্রবন্ধ পূর্ববারের অনুবৃত্তি। শেষ পত্রে প্রকাশিত “প্রিয়তমের প্রতি’ নামক কবিতায় একটি অভূতপূর্ব অসাধারণ নূতনত্ব দেখা গেল; লেখাটি আমরা বঙ্কিমবাবুর পুরাতন রচনা বলিয়াই জানি কিন্তু নির্মাল্যে উক্ত কবিতার নিম্নে রমণীমোহন বসুর নাম প্রকাশিত; ওইটুকু নূতন, নির্লজ্জভাবে নূতন!

নির্মাল্য, জৈষ্ঠ্য, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ২৬

এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী লিখিত “সহরৎ-এ-আম্’ প্রবন্ধটি বিশেষ ঔৎসুক্যজনক। মুসলমান শাসনকালে ভারতবর্ষে পব্লিক-ওয়র্কস-ডিপার্টমেন্ট ছিল- লেখক প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই বিভাগের পারসি নাম ছিল সহরৎ-এ-আম, অর্থাৎ সাধারণের সুবিধা। তাহার এইরূপ কর্তব্য বিভাগ ছিল– “১ম, প্রজাসাধারণের কৃষিকার্য ও জলের সুবিধা। ২য়, ডাকখানার বন্দোবস্ত। ৩য়, ঝটিতি শুভাশুভ সমাচার প্রেরণ বা জ্ঞাপন। ৪র্থ, সমাচার পত্র প্রকাশ করা। ৫ম, পূর্তবিভাগ অর্থাৎ ইঞ্জিনিয়ারিং।’ এই প্রবন্ধে তৎকালীন সংবাদপত্র, ও ডাক বন্দোবস্তের যে আলোচনা আছে তাহা কৌতূহলজনক। পয়ঃপ্রণালী দ্বারা বহুদূর হইতে বিশুদ্ধ জল আনিবার যে ব্যবস্থা ছিল তৎপ্রসঙ্গে লেখক বলিতেছেন– “এখন water works-এর সহিত তখনকার জলের কলের প্রভেদ এই যে, ইঞ্জিনের ব্যবহার মুসলমানদের সময়ে ছিল না, অথচ ইংরাজের জলের কলের ন্যায় অনায়াসে অনর্গল নির্মল জল দিবারাত্রি মিলিত, সুতরাং প্রজাসাধারণের নিকট জলের ট্যাক্স লওয়া হইত না। … পিপাসিতকে পানীয় জল দিয়া তাহার নিকট হইতে পয়সা লওয়া আসিয়ার (oriental) রাজাদিগের ধর্ম ও আচারবিরুদ্ধ। জয়পুর প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের রাজারা প্রজাসাধারণকে জল জোগাইয়া কর গ্রহণ করেন না।’ ইংরাজের ব্যবস্থায় জলও যেমন কলে আসে, সঙ্গে সঙ্গে করও তেমনি কলে আদায় হইয়া যায়। ইংরাজরাজ্যের সুশাসন ও সুব্যবস্থা যে আমাদের কাছে কলের মতো বোধ হয়, তাহা যে অনেক সময় আমাদের কল্পনা এবং হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না তাহার কারণ ইংরাজ-রাজকার্যে রাজোচিত প্রত্যক্ষ ঔদার্য দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজত্ব যেন একটি বৃহৎ দোকান : সওদাগরের “একচেটে’ রাজকার্য-নামক মালগুলি প্রজাদিগকে অগত্যা কিনিতে হয়। এমন-কি, রাজদ্বারে বিচারপ্রার্থী হইলেও দীনতম প্রজাকেও ট্যাঁক হইতে পয়সা গণিয়া দিতে হয়। হইতে পারে, সে কালে বিচারক ঘুষ লইতে ছাড়িত না, কিন্তু তাহা রাজার দাবি নহে, তাহা কর্মচারীর চুরি। তখন রাজপথ, পান্থশালা, দীর্ঘিকা

রাজার দান বলিয়া প্রজারা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করিত। এখন পথকর পাবলিক কর গণিয়া দিয়াও তাহার প্রত্যক্ষফল অল্প লোকে দেখিতে পায়। পূর্বে রাজার জন্মদিনে রাজাই দান বিতরণ করিয়া সাধারণকে বিস্মিত করিয়া দিতেন, এক্ষণে রাজকীয় কোনো মঙ্গলউৎসবে প্রজাদিগকেই চাঁদা জোগাইতে হয়। জেলায় ছোটোলাট প্রভৃতি রাজপ্রতিনিধির শুভাগমনকে আপনাদের নিকট স্মরণীয় করিবার জন্য প্রজাদের আপনাদিগকেই চেষ্টা করিতে হয় এবং তাহাদের সেই কৃতকীর্তিতে রাজা নিজের নাম অঙ্কিত করেন। কানুজংশনে যখন প্লেগ-সন্দিগ্ধদের বন্দীশালা দেখিতাম তখন বারংবার এ কথা মনে হইত যে, অশোকের ন্যায় আকবরের ন্যায় কোনো প্রাচ্য রাজা যদি সাধারণের হিতের জন্য এইপ্রকারের অবরোধ আবশ্যক বোধ করিতেন তবে তাহার ব্যবস্থা কখনোই এমন দীনহীন ও একান্ত অপ্রবৃত্তিকর হইত না– অন্তত নিরপরাধ অবরুদ্ধদের পানাহার রাজব্যয়ে সম্পন্ন হইত; যথেষ্ট বেতনভুক ডাক্তার প্রভৃতিরা সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন অথচ রাজ্যের হিতোদ্দেশে উৎসৃষ্ট যে-সকল দুর্ভাগা তাঁহাদের সযত্নসেব্য অতিথিস্থানীয়, যাহারা পরদেশে বিনাদোষে নিরুপায়ভাবে বন্দীকৃত, হয়তো পাথেয়বান সঙ্গীগণ হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহাদিগকে স্বচেষ্টায় নিজব্যয়ে কষ্টে জীবনধারণ করিতে দেওয়া অন্তত প্রাচ্য প্রজাদের চক্ষে কোনোমতে রাজোচিত বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণের জন্য রাজার হিতচেষ্টা বিভীষিকাময় না হইয়া যথার্থ রমণীয় মূর্তি ধারণ করিত যদি এই-সকল অবরোধশালা এবং মারী হাসপাতালের মধ্যে যত্ন ও ঔদার্য প্রকাশ পাইত। দৃষ্টিমাত্রেই যাহার বহিরাকারে দৈন্য এবং অবহেলা পরিস্ফুট হইয়া উঠে তাহার মধ্যে যে সাংঘাতিক অবস্থায় যথোপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষা মিলিবে ইহা কাহারও প্রতীতি হয় না; রাজপুরুষের নিকট সর্ববিষয়ে আমাদের মূল্য যে কতই অল্প তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া সংকটের সময় আমাদের আতঙ্ক বাড়িয়া যায় এবং তখন ভীতসাধারণকে সান্ত্বনাদান করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ঘোষণাদ্বারা আশ্বাসের দ্বারা যথেষ্ট ফল হয় না; যে-সকল প্রত্যক্ষ রাজচেষ্টা বরাভয় উদারমূর্তি ধারণ করিয়া আমাদের কল্পনাবৃত্তিকে রাজার কল্যাণ ইচ্ছার দিকে স্বতই আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায় তাহাই ফলদায়ক। যাহা সংকল্পে শুভ এবং যাহা পরিণামে শুভ তাহাকে আকারেপ্রকারেও শুভসুন্দর করিয়া না তুলিলে তাহার হিতকারিত্ব সম্পূর্ণ হয়

না, এমন-কি, অনেক সময় তাহা হিতে বিপরীত হয়। যাহা হউক, আলোচ্য প্রবন্ধের জন্য শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের ধন্যবাদার্হ। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার বড়াল ইংরাজি কবি হুড্ রচিত “এ প্যেরেন্টাল ওড্ টু মাই সন্’ নামক কবিতার মর্ম গ্রহণ করিয়া “আদর’ নামক যে কবিতা রচনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে- তাহাতে মূল কবিতার হাস্যমিশ্রিত স্নেহরসটুকু আছে অথচ তাহাতে অনুবাদের সংকীর্ণতা দূর হইয়া কবির স্বকীয় ক্ষমতা প্রকাশ পাইয়াছে। ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ মিত্রের “প্লেগ বা মহামারী’ সুলিখিত সময়োচিত প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত আবদুল করিমের “খলিফাদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ’ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়া গেছে- নব্যভারতে তাহার খণ্ডশ পুনঃপ্রকাশ বাহুল্যমাত্র।

ভারতী, আষাঢ়, ১৩০৫। নব্যভারত, জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ়, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ২৭

বাংলায় আজকাল ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্যের অন্য সকল বিভাগকে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে, “সাহিত্য’ পত্রের সমালোচ্য তিন সংখ্যা তাহার প্রমাণ। মাঘের পত্রে “রাজা টোডরমল্’, রানী ভবানী’ এবং “বাংলার ইতিহাসে বৈকুণ্ঠ’ এই তিনটি প্রবন্ধ প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। “রানী ভবানী’ একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ, অনেক দিন হইতে খণ্ডাকারে সাহিত্যে বাহির হইতেছে। “বৈকুণ্ঠ’ প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর প্রতি ইতিহাসের অন্যায় অভিযোগ সকল ক্ষালনের চেষ্টা করিয়াছেন। নবাবী আমল সম্বন্ধে প্রচলিত ইতিহাসের চূড়ান্ত বিচারের উপরেও যে আপিল চলিতে পারে সুযোগ্য লেখক মহাশয় তাহা প্রমাণ করিয়াছেন। আমাদের মনে ক্রমে সংশয় জন্মিতেছে যে বাল্যকালে বহুকষ্টে যে কথাগুলো মুখস্থ করিয়াছি, প্রৌঢ়বয়সে আবার তাহার প্রতিবাদগুলি মুখস্থ করিতে হয় বা! পরীক্ষাশালা হইতে নির্গত হইয়া ওগুলো যাঁহারা ভুলিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই সৌভাগ্যবান। ফাল্গুন ও চৈত্রের সাহিত্যে “রানী ভবানী’, “মগধের পুরাতত্ত্ব’ এবং “রত্নাবলীর রচয়িতা শ্রীহর্ষ’ এই তিনটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ সর্বাপেক্ষা অধিক স্থান ও মাহাত্ম্য লাভ করিয়াছে। কোন্ শ্রীহর্ষ রত্নাবলী-রচয়িতা বলিয়া খ্যাত তাহার নির্ণয়ে লেখক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় যথেষ্ট অনুসন্ধান প্রকাশ করিয়াছেন। “সহযোগী সাহিত্যে’ লেখক মহাশয় সমালোচনা সম্বন্ধে যে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছেন তাহাতে লেখকসম্প্রদায় পরম উপকৃত হইবেন। আমরা তাহা উদ্‌ধৃত করিলাম। “অস্মদ্দেশে সাহিত্যসেবা নিতান্তই শখের জিনিস; তজ্জন্য সাহিত্যসেবীরাও অসাধারণ সূক্ষ্মচর্মী। কেহ আমাদিগের রচনার সমালোচনা করিয়া কেবল প্রশংসা না করিয়া কোনোরূপ দোষ দেখাইলে আর আমাদিগের সহ্য হয় না। আমরা তাহার প্রতিবাদে সমালোচকের যুক্তির বিরুদ্ধে যুক্তি না দেখাইয়া তাঁহার উপর কেবল গালিবর্ষণ করি। আমাদিগের আত্মীয়, বন্ধুরা আশ্রিত অনুগতদিগের মধ্যে কেহ সমালোচককে গালি দিবার ভার গ্রহণ না করিলে আপনারই মাসিকপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া

বা সভা ডাকিয়া, সমালোচককে গালি দিয়া আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান করি, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর পরিতৃপ্তি অনুভব করিয়া থাকি। আবার আমাদের “লিটারারি’ মোসাহেবগণ আমাদের এইরূপ কার্যকেও মহৎ কার্য বলিয়া আমাদিগকে আত্মদোষের বিষয়ে অন্ধ করিতে ত্রুটি করে না।’ এরূপ তীব্র ভাষায় এরূপ অনুভব-উক্তি আমরা দেখি নাই। কিন্তু লেখক নিজের প্রতি যতটা কালিমা প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার প্রয়োজন ছিল না। কারণ সূক্ষ্মচর্ম কেবল তাঁহার একলার নহে, প্রায় লেখকমাত্রেরই। এবং তিনি আত্মগ্লানির প্রাবল্যবশত লেখকবর্গ সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন ঠিক সেই কথাই সমালোচকদিগকেও বলা যায়। সকল লেখাও নির্দোষ নহে, সকল সমালোচনাও অভ্রান্ত নহে। কিন্তু মাংসাশী প্রাণীর মাংস যেরূপ ভক্ষ্য নহে, সেইরূপ সমালোচকের সমালোচনা সাহিত্যসমাজে অপ্রচলিত। সমালোচনার উপযোগিতা সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ হইতে পারে না। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সমালোচকের প্রবীণতা অভিজ্ঞতা ও উপযুক্ত শিক্ষা অভাবে আমাদের দেশের সমালোচনা অনেক স্থলেই কেবলমাত্র উদ্ধত স্পর্ধার সূচনা করে, এবং কেমন করিয়া নিঃসংশয়ে জানিব যে তাহা “আদর্শের ক্ষুদ্রতা, উদ্দেশ্যের হীনতা ও হৃদয়ের নীচতার পরিচয় প্রদান’ করে না? যে লেখকের কিছুমাত্র পদার্থ আছে তাঁহার স্বপক্ষ বিপক্ষ দুই দলই থাকিবে – বিপক্ষ দল স্বপক্ষকে বলেন স্তাবক, এবং স্বপক্ষ দল বিপক্ষকে বলেন নিন্দুক; সমালোচ্য প্রবন্ধের লেখকও কোনো এক পক্ষকে লক্ষ্য করিয়া “মোসাহেব’ “স্তাবক’ বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অধিকাংশ স্থলেই ভক্তকে “স্তাবক’ এবং বিরক্তকে “নিন্দুক’ বলে তাহারাই, যাহারা সত্য প্রচার করিতে চাহে না, বিদ্বেষ প্রকাশ করিতে চায়। কিন্তু লেখক যখন বিশ্বসাধারণের বিশেষ হিতের জন্য সমালোচনার উপকারিতা সম্বন্ধে নিরতিশয় পুরাতন ও সাধারণ সত্য প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত, কোনো ব্যক্তিবিশেষকে আক্রমণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে তখন এ-সকল বিদ্বেষপূর্ণ অত্যুক্তি অসংগত শুনিতে হয়।

সাহিত্য, গতবর্ষের [১৩০৪] মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্রের সাহিত্য একত্রে হস্তগত হইল

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ২৮

“বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সম্প্রদায়’। লেখক মহাশয় বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধ সমালোচকদের প্রতি এতই রুষ্ট হইয়াছেন যে প্রবন্ধের একস্থলে উল্লেখ করিয়াছেন “ইনিও (বঙ্কিমবাবু) নিন্দুকের নিন্দা অথবা মূর্খের ধৃষ্টতা হইতে নিরাপদ হইতে পারেন নাই!’ এইরূপ সাধারণভাবের রূঢ় উক্তি, হয় অনাবশ্যক, নয় অন্যায়। কারণ, নিন্দুক ও মূর্খগণ, কেবল বঙ্কিমবাবুর সম্বন্ধে কেন, অনেকেরই সম্বন্ধে নিন্দা ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করিয়া থাকে– সেটা কিছু নূতন কথাও নহে, আশ্চর্যের কথাও নহে। তবে যদি এ কথা লেখকের বলিবার অভিপ্রায় হয় যে, যাহারা বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছে তাহার মূর্খ ও নিন্দুক তবে তিনি নিজেও অপবাদভাজন হইবেন। “সাহিত্য ও সমাজ’ নামক পুস্তিকায় বিষবৃক্ষের কী সমালোচনা বাহির হইয়াছে দেখি নাই; লেখক সমালোচ্য প্রবন্ধে তাহার যেরূপ মর্ম উদ্ধার করিয়াছেন তাহা যদি অযথা না হইয়া থাকে, তবে সেই সমালোচক মহাশয় অন্তত বুদ্ধিপ্রভাবের পরিচয় দেন নাই। কিন্তু “মীরকাসিম’-লেখকের প্রতি মতবিরোধ লইয়া অবজ্ঞা প্রকাশের অধিকার কাহারও নাই। বঙ্কিমবাবুর প্রতি ভক্তি সম্বন্ধে আমরা সমালোচ্য প্রবন্ধলেখকের অপেক্ষা ন্যূনতা স্বীকার করিতে পারি না, তাই বলিয়া মীরকাসিম-লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয়ের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন আমরা উচিত বোধ করি না। কারণ, ক্ষমতাবলে তিনিও বঙ্গসাহিত্যহিতৈষীগণের সম্মানভাজন হইয়া উঠিতেছেন। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে অন্য হিসাবে অক্ষয়বাবুর সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই। কালানুক্রমে ভূপঞ্জরের যেরূপ স্তর পড়িয়াছিল হিমালয় পর্বতে তাহার অনেক বিপর্যয় দেখা যায়, তাই বলিয়া কোনো ভূতত্ত্ববিৎ হিমালয়কে খর্ব করিলেও কালিদাসের নিকট তাহার দেবাত্মা গুপ্ত থাকে না। বঙ্কিমবাবুর উপন্যাসে ইতিহাস যদি বা বিপর্যস্ত হইয়া থাকে তাহাতে বঙ্কিমবাবুর কোনো খর্বতা হয় নাই। উপন্যাসের [ইতিহাসের] বিকৃতি হইয়াছে বলিয়া নালিশ করাও যা, আর ধান্যজাত মদিরা অন্ন হইয়া উঠে নাই বলিয়া রাগ করাও তাই। উপকরণের মধ্যে ঐক্য থাকিতে পারে কিন্তু তবুও অন্ন

মদ্য নহে এবং মদ্য অন্ন নহে এ কথাটা গোড়ায় ধরিয়া লইয়া তবে বস্তু-বিচার করা উচিত। অক্ষয়বাবু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে,যদি ইতিহাসকে মানিবে না তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার প্রয়োজন কী? তাহার উত্তর এই যে, ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে ধনে হলুদ শর্ষের সন্ধান করেন। মসলা আস্ত রাখিয়া যিনি ব্যঞ্জনে স্বাদ দিতে পারেন তিনি দিন, এবং যিনি বাঁটিয়া ঘাঁটিয়া একাকার করিয়া স্বাদ দিয়া থাকেন তাঁহার সঙ্গেও আমার কোনো বিবাদ নাই, কারণ স্বাদই এ স্থলে লক্ষ্য, মসলা উপলক্ষ মাত্র। কিন্তু ইতিহাস অক্ষয়বাবুর এতই অনুরাগের সামগ্রী যে ইতিহাসের প্রতি কল্পনার লেশমাত্র উপদ্রব তাঁহার অসহ্য, সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে নবীনবাবু তাহা টের পাইয়াছেন। ইতিহাস-ভারতীর উদ্যানে চঞ্চলা কাব্য-সরস্বতী পুষ্পচয়ন করিয়া বিচিত্র ইচ্ছানুসারে তাহার অপরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, প্রহরী অক্ষয়বাবু সেটা কোনোমতেই সহ্য করিতে পারেন না – কিন্তু মহারানীর খাস হুকুম আছে। উদ্যান প্রহরীরই জিম্মায় থাক্, কিন্তু এক সখীর কুঞ্জ হইতে আর-এক সখী পূজার জন্য হৌক বা প্রসাধনের জন্য হৌক যদি একটা ডালি ফুল পল্লব তুলিয়া লইয়া যায় তবে তিনি তাহার কৈফিয়তের দাবি করিয়া এত গোলমাল করেন কেন? ইহাতে ইতিহাসের কোনো ক্ষতি হয় না অথচ কাব্যের কিছু শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিশেষ স্থলে যদি শ্রী সাধন না হয় তবে কাব্যের প্রতি দোষারোপ করা যায় সৌন্দর্যহানি হইল বলিয়া, সত্য হানি হইল বলিয়া নহে।

পূর্ণিমা, শ্রাবণ, ১৩০৫(?)

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ২৯

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসুর “বন্ধুবৎসল বঙ্কিমচন্দ্র’ প্রবন্ধটি আন্তরিক সহৃদয়তা ও সরলতাগুণে সবিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। সাধারণ লেখকের হস্তে পড়িলে সুলভ এবং শূন্য হৃদয়োচ্ছ্বাসের আড়ম্বরে প্রবন্ধটি স্ফীত ফেনিল হইয়া উঠিত। “সমরু’ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় নবাবী আমলের সৈন্যরচনায় য়ুরোপীয় নায়কদিগের কর্তৃত্ব আলোচনা করিয়াছেন। “চৈতালি-সমালোচনা সম্বন্ধে বক্তব্য’ নামক প্রবন্ধরচয়িতার প্রতি ভারতী-সম্পাদক যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তবে প্রার্থনা করি পাঠকগণ সেই অহমিকা ক্ষমা করিবেন। কোনো লেখকের কবিতা যে সকল পাঠকেরই ভালো লাগিবে এমন দুরাশা কেহ করিতে পারেন না, কিন্তু যিনি সরল শ্রদ্ধার সহিত তাহার মর্মগ্রহণে প্রবৃত্ত হন এবং উপভোগের আনন্দ মুক্তভাবে প্রকাশ করেন তাঁহার উৎসাহ লেখকের কাব্যকাননে বসন্তের দক্ষিণ সমীরণের ন্যায় কার্য করে। “ঋণ-পরিশোধ’ গল্পে ভাষার সরসতা সত্ত্বেও ঘটনা বর্ণনা এবং চরিত্র রচনার মধ্যে একটা বানানো ভাব থাকাতে তাহা পাঠকের নিকট সত্যবৎ প্রত্যয়জনক হইয়া উঠে নাই। প্রভাতকুমারের অধিকাংশ কবিতায় যে একটি প্রচ্ছন্ন স্নিগ্ধ হাস্য থাকে “অনন্ত শয্যা’ কবিতাটির মধ্যেও তাহা পাওয়া যায়।

প্রদীপ, আষাঢ়, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ৩০

এখানি একটি শিক্ষা-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা। শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত-কর্তৃক সম্পাদিত।

আমরা এই পত্রিকার উন্নতি প্রার্থনা করি। শিক্ষাপ্রণালীর উৎকর্ষবিধান সম্বন্ধে য়ুরোপে উত্তরোত্তর আলোচনা বাড়িয়া চলিয়াছে। শিক্ষা কী উপায়ে সহজ, মনোরম স্থায়ী এবং যুক্তিসংগত হইতে পারে তৎসম্বন্ধে নানা প্রকার পদ্ধতি এবং পুস্তকের প্রচার হইতেছে। ইংরাজি ভাষায় শিক্ষাসাধন করিতে হয় বলিয়া বাঙালির শিক্ষাকার্য একটি গুরুতর ভারস্বরূপ হইয়া আমাদের শরীর মনকে জীর্ণ করিতেছে– অতএব শিক্ষার নবাবিষ্কৃত সহজ ও প্রকৃষ্ট পথগুলির সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের দেশে বিশেষ ফলপ্রদ হইবার কথা কিন্তু আমাদের দেশের উদাসীন শিক্ষকগণ চিরপ্রচলিত দুঃখাবহ পথগুলি যে সহজে ছাড়িবেন এমন আশা রাখি না। যাহা হউক, আমাদের স্কুলে প্রচলিত বিশেষ বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়, যথা ইতিহাস, ভূগোল, পাটিগণিত, জ্যামিতি, সংস্কৃতভাষা, ইংরাজিভাষা, ব্যাকরণ, প্রকৃতিবিজ্ঞান প্রভৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিস্তারিত আলোচনা এবং প্রতিবৎসর যে-সকল পাঠ্যপুস্তক নির্দিষ্ট ও পরীক্ষার প্রশ্ন দেওয়া হয় তাহার উপযুক্ত সমালোচনা আমরা অঞ্জলির নিকট হইতে আশা করি।

অঞ্জলি । জ্যৈষ্ঠ [১৩০৫]। ২য় সংখ্যা।

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ৩১

শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর “প্রতীত্যসমুৎপাদ’ প্রবন্ধটি চিন্তাপূর্ণ। নামটি এবং বিষয়টি আমাদের অপরিচিত। লেখক বলিতেছেন, ভগবান শাক্যকুমার সিদ্ধার্থ “বোধিদ্রুমমূলে বুদ্ধত্বলাভের সময় জীবনব্যাধির কারণস্বরূপ দ্বাদশটি নিদানের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিদানতত্ত্বের নাম প্রতীত্যসমূৎপাদ। দ্বাদশটি নিদানের নাম যথাক্রমে এই– অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, যড়ায়তন, স্পর্শ বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরামরণ।’ এই নিদানতত্ত্বের ব্যাখ্যা লইয়া নানা মত আছে, ত্রিবেদী মহাশয় তাহাতে আর-একটি যোগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা কিয়দ্দূর পর্যন্ত শক্ত মাটির উপর দিয়া আসিয়া চোরাবালির মধ্যে হারাইয়া গেছে; পরিণাম পর্যন্ত পৌঁছে নাই। ত্রিবেদী মহাশয়ের ব্যাখ্যার প্রথমাংশ যদি ইতিহাসসংগত হয়, অর্থাৎ স্বাধীন যুক্তিমূলক না হইয়া যদি নানা বৌদ্ধশাস্ত্র ও সাহিত্যদ্বারা পোষিত হয়, তবে ইহা সত্য যে, বৌদ্ধদর্শন আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞানমূলক দর্শনের সহিত প্রধানত একমতাত্মক। কিন্তু প্রচুর ঐতিহাসিক প্রমাণ ব্যতীত এ সম্বন্ধে কথা চূড়ান্ত হইতে পারে না। অতএব ত্রিবেদী মহাশয় যে পথে চিন্তা প্রয়োগ করিয়াছেন সেই পথে গবেষণারও প্রেরণ আবশ্যক। “একনিষ্ঠ বিবাহ’ প্রবন্ধটি সংক্ষিপ্ত তথ্যপূর্ণ সুপাঠ্য। “মহারাজ রামকৃষ্ণ’ পাঠকদের বহুআশাউদ্দীপক একটি প্রবন্ধের প্রথম পরিচ্ছেদ। লেখক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র লিখিতেছেন “ইংরাজেরা যখন দেওয়ানি সনন্দ লাভ করেন, তখন জমিদারদল পদগৌরবে ও শাসনক্ষমতায় সর্বত্র গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। মহারাজ রামকৃষ্ণ ও তাঁহার সমসাময়িক জমিদারদিগের সময়ে সেই পদগৌরব ধূলিপটলের ন্যায় উড়িয়া গিয়াছে। সেকালের জমিদারগণ কী কৌশলে একালের উপাধিব্যাধিপীড়িত ক্রীড়াপুত্তলে পরিণত হইয়াছিলেন, মহারাজ রামকৃষ্ণের জীবনকাহিনী কিয়ৎপরিমাণে তাহার রহস্যোদ্‌ঘাটন করিতে সক্ষম।’

ভারতী, শ্রাবণ, ১৩০৫। সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ৩২

“জীবজ্যোতি নির্বাচন’ প্রবন্ধটি সরল অথচ গভীর এবং চিন্তাউদ্রেককারী। জাতি নির্বাচন যে কত কঠিন তাহাই প্রমাণপূর্বক সেই সোপান বাহিয়া লেখক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় অভিব্যক্তিবাদের সীমায় আসিয়া উপনীত হইয়াছেন। এই সংখ্যায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সচিত্র জীবনচরিতের প্রথম অংশ পাঠ করিয়া সুখী হইলাম।

প্রদীপ, শ্রাবণ, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ৩৩

“বণিক বন্ধু’ নামক প্রবন্ধে পণ্য ও বণিক্ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় আলোচনা উদ্‌ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। “সংস্কৃত পণ ধানু হইতে বণিজ্ শব্দ সিদ্ধ করা হইয়াছে। বৈয়াকরণেরা বণ ধাতু না করিয়া পণধাতু কেন করিলেন উহার তত্ত্ব এক রহস্যময় ব্যাপার। পুরাকালে রোমানেরা ফিনিসিয়ানদিগকে পুণিক বলিত। পুণিকেরা অতিবৈয়াকরণ যুগে ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। ভারতবাসীরা পুণিকদিগকে পণিক বলিত। পণিক সাধিবার জন্য পণ ধাতুর সৃষ্টি হইল। উত্তর কালে (আভিধানিক কালে) পণ ধাতুর চিহ্ন পণ্য রাখিয়া পণিকদের মাহাত্ম্য বিলোপ হওয়াতে পণিকনামও সংস্কৃত অভিধান হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। পণিকদের পরে– সুদীর্ঘকাল পরে ভেনিজিয়া বা বণিজগণ ভারতে আগমন করে। তখন বৈয়াকরণিক ঋষিযুগ অতীত হইয়াছে। সংস্কৃতের আইনকানুন হইয়াছে, সংস্কৃত পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গী, কাজেই পরবর্তীরা অনন্যোপায় হইয়া নবাগত বিজাতীয় শব্দগুলিকে নিপাতনের হাত ছোঁয়াইয়া শুদ্ধ করিয়া লইলেন। বণিজ্ শব্দও সেইরূপ শোধিত ও পণ ধাতুর পোষ্যপুত্র হইল। এই ভেনিস বা বণিজ্‌দের অতি আদরের সামগ্রী বলিয়া নীল বণিকবন্ধু আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল।’

অঞ্জলি। আষাঢ় [১৩০৫]

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ৩৪

“জ্যৈষ্ঠ্যের সাহিত্যে “মোহনলাল’ প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় অক্ষয়বাবু ও নিখিলবাবুর প্রতিবাদ করিয়া যে তর্ক তুলিয়াছেন তাহার মীমাংসা আমাদের আয়ত্তাতীত। লেখাটি ভাষার সরস সুস্পষ্টতা ও প্রমাণ সংগ্রহ ও বাঙালি পাঠকের বিশেষ আগ্রহজনক কয়েকটি নূতন তথ্যের জন্য বিশেষ উপাদেয় হইয়াছে। “সেকালের কলিকাতা গেজেট’ সুপাঠ্য কৌতুকাবহ প্রবন্ধ। আষাঢ়ে নিখিলবাবুর “মীরণের পরিণাম রহস্য’ রহস্যপূর্ণ উপন্যাসের ন্যায় ঔৎসুক্যজনক।

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু-কর্তৃক সম্পাদিত।

বর্তমান সম্পাদকের হস্তে আসিয়া অবধি এই পত্রিকা আশাতীত গৌরব লাভ করিয়াছে। এখন ইহার কোনো সংখ্যাই অবহেলাপূর্বক হারাইতে দেওয়া যায় না – ইহার প্রতি সংখ্যাই বঙ্গসাহিত্যের একটি মূল্যবান ভাণ্ডার নির্মাণ করিয়া তুলিতেছে। সম্পাদক মহাশয় তাঁহার গুরুতর কর্তব্য যথারূপে নির্ণয় করিতে পারিয়াছেন এবং তাহা পালন করিবার শক্তিও তাঁহার আছে।

ভারতী, ভাদ্র, ১৩০৫। সাহিত্য, জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ় [১৩০৫] সংখ্যা একত্রে হস্তগত হইল

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ৩৫

“বেনামী চিঠি’ কৌতুকরসপূর্ণ ক্ষুদ্র সুলিখিত গল্প। গত বৎসর সূর্যের পূর্ণগ্রাস পরিদর্শন উপলক্ষে দেশবিদেশ হইতে পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সমবেত হইয়াছিলেন। কাপ্তেন হিল্স্ কেম্ব্রিজের নিউয়ল সাহেব পুলগাঁও স্টেশনে গ্রহণ পর্যবেক্ষণের জন্য শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারত গবর্মেন্ট ইঁহাদের সহায়তার জন্য দেরাদুন হইতে কর্মচারী প্রেরণ করিয়াছিলেন। “পুলগাঁওয়ে সূর্যগ্রহণ’ প্রবন্ধের লেখক তাঁহাদের মধ্যে একজন। কীরূপ বহুচেষ্টাকৃত অভ্যাস ও সতর্কতার সহিত কিরূপ যন্ত্রসাধ্যবৎ শৃঙ্খলা সহকারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সূর্যগ্রাসের বৈজ্ঞানিক পরিদর্শনকার্য সমাধা হয় এই প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। “ছেলেকে বিলাতে পাঠাইব কি?’ প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত তাঁহার স্বাভাবিক সরস ভাষায় সময়োপযোগী আলোচনার অবতারণা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস এই যে, বিলাতফেরতার দল যত সংখ্যায় বাড়িবে ততই তাঁহাদের বাহ্য বেশভূষার অভিমান ও উদ্ধত স্বাতন্ত্র্য কমিয়া যাইবে। প্রথম চটকে যে বাড়াবাড়ি হয় তাহার একটা সংশোধনের সময় আসে। হিন্দুসমাজও ক্রমে আপন অসংগত ও কৃত্রিম কঠোরতা শিথিল করিয়া আনিতেছে, তাঁহারাও যেন তাঁহাদের পুরাতন পৈতৃক সমাজের প্রতি অপেক্ষাকৃত বিনীতভাবে ধারণ করিতেছেন। তাহা ছাড়া বোধ করি কন্‌গ্রেস উপলক্ষে বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশের সবল ও সরল জাতীয় ভাবের আদর্শ আমাদের পক্ষে সুদৃষ্টান্তের কাজ করিতেছে। এই সংখ্যায় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সুরচিত জীবনী শেষ হইয়া পরলোকগত দীনবন্ধু মিত্রের সচিত্র জীবনচরিত বাহির হইয়াছে। স্বদেশের মহৎজীবনী প্রচারের দ্বারা প্রদীপ উত্তরোত্তর জ্যোতি লাভ করিতেছে।

প্রদীপ, ভাদ্র, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ৩৬

"বিশ্বরচনা' প্রবন্ধটি সুগম্ভীর। "জগৎশেঠ' নিখিলবাবুর রচিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধগুলিতে বাংলার ইতিহাস উত্তরোত্তর সঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া আমরা আশান্বিত হইতেছি। "রাজা রামানন্দ রায়' স্বনামখ্যাত বৈষ্ণব মহাত্মার জীবনচরিত; উৎসাহের ক্ষুদ্রায়তনবশত ক্ষুদ্রখণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে ইহাই এ প্রবন্ধের একমাত্র দোষ। "ভূগর্ভে' বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ যত্নপূর্বক পাঠ্য। আষাঢ় মাসের উৎসাহে "হেস্টিংসের শিক্ষানবিশী' প্রবন্ধে সংক্ষেপে অনেক গুরুতর কথার সন্নিবেশ আছে। হেস্টিংস যখন ইংরাজের নবরাজ্যক্ষেত্রে সবেমাত্র অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছেন তখনি বর্ধিতপ্রতাপ নন্দকুমারের ছায়া তাঁহাকে অভিভূত করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর যখন হেস্টিংসের দিন আসিল তখন কি তিনি সে কথা একেবারে ভুলিয়াছিলেন?

উৎসাহ, জৈষ্ঠ্য ও আষাঢ়, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ৩৭

আমরা আশা করি, অঞ্জলিতে শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তারিত প্রবন্ধ বাহির হইবে; নতুবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শিক্ষকেরা বিশেষ সাহায্য লাভ করিতে পারিবেন না। আজকাল শিক্ষাপদ্ধতি লইয়া ইংরাজিতে এত পুস্তক এবং পত্রিকা বাহির হইতেছে যে শিক্ষাসুগমের নূতন নূতন উপায় সম্বন্ধে লেখা শেষ করা যায় না। “উচ্চারণ দোষ সংশোধন’, “ভৌগোলিক নাম লিখন ও পঠন’, পুনরালোচনা’ প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট বিস্তীর্ণ হয় নাই- অনেকটা সাধারণ কথার উপর দিয়াই গিয়াছে। এবারকার অঞ্জলিতে “সোনারূপার বিবাদ’ প্রবন্ধটি প্রাঞ্জল এবং সময়োপযোগী হইয়াছে। বর্তমান কালে মুদ্রাবিপাকের আলোচনা দেশে বিদেশে জাগিয়া উঠিয়াছে অথচ এ সম্বন্ধে মোটামুটি কথাও আমাদের দেশের অনেকের অগোচর।

অঞ্জলি, শ্রাবণ, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ৩৮

বর্তমান সংখ্যাটি বিচিত্র বিষয় বিন্যাসে বিশেষ ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে। পত্রিকায় চণ্ডিদাসের যে নূতন পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে তাহা বহু মূল্যবান। বিশেষত কয়েকটি পদের মধ্যে চণ্ডিদাসের জীবনবৃত্তান্তের যে আভাস পাওয়া যায় তাহা বিশেষ কৌতুকাবহ। সম্পাদক মহাশয় আদর্শ পুঁথির বানান সংশোধন করিয়া দেন নাই সেজন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদভাজন। প্রাচীন-গ্রন্থ-সকলের যে-সমস্ত মুদ্রিত সংস্করণ আজকাল বাহির হয় তাহাতে বানান-সংশোধকগণ কালাপাহাড়ের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন| তাঁহারা সংস্কৃত বানানকে বাংলা বানানের আদর্শ কল্পনা করিয়া যথার্থ বাংলা বানান নির্বিচারে নষ্ট করিয়াছেন। ইহাতে ভাষাতত্ত্বজিজ্ঞাসুদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছে। বর্তমান সাহিত্যের বাংলা বহুল পরিমাণে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের উদ্‌ভাবিত বলিয়া বাংলা বানান, এমন-কি বাংলা পদবিন্যাস-প্রণালী তাহার স্বাভাবিক পথভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, এখন তাহাকে স্বপথে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু আধুনিক বাংলার আদর্শে যাঁহারা প্রাচীন পুঁথি সংশোধন করিতে থাকেন তাঁহারা পরম অনিষ্ট করেন।

“স্ত্রী কবি মাধবী’ প্রবন্ধের প্রারম্ভে লেখক শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী লিখিয়াছেন– “এ পর্যন্ত প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আমরা একজনমাত্র স্ত্রী-কবির কবিতাকুসুমের সৌরভ সুষমার সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছি, তিনিই মাধবী দেবী।’ মাধবী উৎকলবাসিনী। প্রবন্ধে তাঁহার রচিত বাংলা পদাবলীর যে আদর্শ পাওয়া গিয়াছে তাহা বিস্ময়জনক। তাহার ভাষা পুরুষ বৈষ্ণব কবিদের অপেক্ষা কোনো অংশেই ন্যূন নহে। সেই প্রাচীনকালে উৎকল ভূমি বাংলা ভাষার উপর যে অধিকার লাভ করিয়াছিল এক্ষণে নব্যউৎকল তাহা স্বেচ্ছাপূর্বক পরিত্যাগ করিতেছে তাহা বাংলার পক্ষে দুঃখের কারণ এবং উৎকলের পক্ষেও দুর্ভাগ্যের বিষয়।

“গৌড়াধিপ মহীপালদেবের তাম্রশাসন’ দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসুর সহায়তায় বর্তমান পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হইয়াছে। “বিলাসপুর নামক

জয়স্কন্ধাবার হইতে, বিষুবসংক্রান্তিতে গঙ্গাস্নান করিয়া পরম সৌগত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ মহীপালদেব ভট্টপুত্র হৃষীকেশের পৌত্র, মধুসূদনের পুত্র, পরাশর-গোত্রজ (শক্তি, বশিষ্ঠ ও পরাশর প্রবরভুক্ত) যজুর্বেদান্তর্গত বাজসনেয়-শাখাধ্যায়ী চাবটিগ্রামবাসী ভট্টপুত্র কৃষ্ণাদিত্যশর্মাকে বর্তমান তাম্রশাসন দান করেন।' যিনি দিয়াছেন এবং তাম্রশাসনোক্ত যে গ্রাম দান করা হইয়াছে পত্রিকায় তাহার আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু যাঁহাকে দেওয়া হইয়াছে তাঁহার সম্বন্ধে কোনোরূপ আলোচনাই নাই। কুলজিগ্রন্থ হইতে তাঁহার বিবরণ উদ্ধার করিলে ঐতিহাসিক কাল নির্ণয়ের অনেক সহায়তা হয়।

"ধোয়ী কবির পবনদূত' প্রবন্ধটি বিশেষ মনোহর হইয়াছে। গীতগোবিন্দের শ্লোকে ধোয়ী কবির নামোল্লেখ অনেকে দেখিয়াছেন। অনেক দিন অনুসন্ধানের পর সম্প্রতি তাঁহার রচিত পবনদূত কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাহার যে বিবরণ এবং মধ্যে মধ্যে অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত সরস হইয়াছে।

"পাঁচালিকার ঠাকুরদাস' প্রবন্ধে লেখক শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তাফি বাংলা পাঁচালি-সাহিত্য-ইতিহাসের একাংশ উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন।

ভারতী, আশ্বিন, ১৩০৫। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, ৩য় সংখ্যা, ১৩০৫

সাময়িক সাহিত্য সমালোচনা – ৩৯

প্রদীপ। আশ্বিন ও কার্তিক [১৩০৫]

এই যুগল-সংখ্যক প্রদীপ পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ পরিতৃপ্ত হইয়াছি। ইহার প্রায় প্রত্যেক গদ্য প্রবন্ধই আদরণীয় হইয়াছে। বাংলা সাময়িক পত্রে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী-রচিত “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’-এর মতো প্রবন্ধ কদাচিৎ বাহির হয়। শাস্ত্রীমহাশয় প্রচুর ভাবসম্পদের অধিকারী হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের প্রতি কৃপণতা করিয়া থাকেন এ অপবাদ তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে।

“হামির’ প্রবন্ধটি বিষয়গুণে চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

“হাফ্‌টোন্‌ ছবি’ শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর রচনা। অনেকেই হয়তো জানেন না হাফ্‌টোন্‌ লিপি সম্বন্ধে উপেন্দ্রবাবুর নিজের আবিষ্কৃত বিশেষ সংস্কৃত পদ্ধতি বিলাতের শিল্পী-সমাজে খ্যাতি লাভ করিয়াছে; উপেন্দ্রবাবু স্বাভাবিক বিনয়বশত তাঁহার প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও এ ঘটনার আভাসমাত্র দেন নাই। তিনি বাঙালির মধ্যে প্রথম নিজচেষ্টায় হাফ্‌টোন্‌ শিক্ষা করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই তাহার সংস্কার সাধনে কৃতকার্য হন। ভারতবর্ষের প্রতিকূল জলবায়ু এবং সর্বপ্রকার সহায়তা ও পরামর্শের অভাব সত্ত্বেও এই নূতন শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত এবং তাহাকে সংস্কৃত করিতে যে কী পরিমাণ অধ্যবসায় ও মানসিক ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা অব্যবসায়ীর পক্ষে মনে আনাই কঠিন। উপেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ অপেক্ষা তাঁহার রচিত যে সুন্দর আলেখ্যগুলি প্রদীপে বাহির হইয়াছে তাহাতেই তাঁহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া যায়।

“হীরার মূল্য’ নামক ছোটো গল্পটিতে লেখক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের স্বাভাবিক প্রতিভা পরিস্ফুট হইয়াছে। গল্পটি ভাষার শ্রী, আখ্যায়িকার কৌশল, চরিত্ররচনার সহজ-নৈপুণ্য এবং সংক্ষিপ্ত সংহত উজ্জ্বলতাগুণে হীরকখণ্ডের মতো দীপ্তি পাইতেছে। গল্পটি

পাঠ করিতে করিতে নবাব পরিবারের একটি হিন্দুস্থানী আবহাওয়া পাঠকের অন্তঃকরণকে বেষ্টন করিয়া ধরে। “রাসায়নিক পরিভাষা’ খ্যাতনামা বিজ্ঞানাচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের রচনা। প্রফুল্লবাবু বিশুদ্ধ বাংলা রাসায়নিক পরিভাষা প্রচলনের পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে তিনি জর্মানির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে যেখানে লাটিনমূলক পরিভাষা গৃহীত হইয়াছে জর্মানেরা সে স্থলে স্বদেশীভাষামূলক পরিভাষা ব্যবহার করিতেছেন।

প্রফুল্লবাবু আর-একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। অদ্বিতীয় পণ্ডিত মান্ডেলিয়েফ্ রাসায়নিক তত্ত্বে নূতন পথ-প্রদর্শক। ইনি রুশীয়। “কিছুদিন হইল এই জগদ্‌বিখ্যাত রাসায়নিক ও তাঁহার সহযোগীগণ স্বদেশপ্রেমে পূর্ণ হইয়া দৃঢ় সংকল্প করিলেন, আর পরকীয় ভাষায় বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বা গ্রন্থ রচনা করা হইবে না। পাশ্চাত্য রাসায়নিকগণ মহাসংকটে পড়িলেন। কাজেই অনেকে রুশীয় ভাষা শিক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। রসায়নবিদ্যায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রবন্ধলেখকের দুই জন বিলাতি বন্ধু কঠোর পরিশ্রমের পর মান্ডেলিয়েফ্ মূল ভাষায় পাঠ করিয়া সার্থকতা লাভ করেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, হতভাগ্য বাংলা ভাষা কি এতই অপরাধ করিল যে, ইহাকে রাসায়নিক পরিভাষা সংকলন হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে।’ বঙ্গভাষাও রুশীয় ভাষার ন্যায় গৌরব লাভ করিবে এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে আমরা আর সংকোচ বোধ করি না; সম্প্রতি যে দুই-একজন বাঙালি আমাদিগকে এই উচ্চ আশার দিকে লইয়া যাইতেছেন ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাদের মধ্যে একজন।

“দাতা কালীকুমার’ প্রবন্ধে লেখক এ কথা সম্পূর্ণ প্রমাণ করিয়াছেন যে স্বর্গগত কালীকুমার দত্তের জীবনবৃত্তান্ত কোনোমতেই বিস্মৃতির যোগ্য নহে। আশা করি এই মহাত্মার সম্পূর্ণ জীবনচরিত আমরা গ্রন্থাকারে দেখিতে পাইব। দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থা ও নূতন শিক্ষায় একান্নবর্তী পরিবারবন্ধন বিশ্লিষ্ট হইবার সময় আসিয়াছে; কালীকুমার দত্তের মহৎ জীবনবৃত্তান্ত ভবিষ্যৎ বাঙালি পাঠকের নিকট প্রাচীন বাংলা সমাজের এক উজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কিত করিয়া রাখিবে। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বর্তমান সংখ্যক প্রদীপে তাঁহার বন্ধু এবং ভারতের বন্ধু আনন্দমোহন বসু সম্বন্ধে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, “আনন্দমোহনের জীবনে প্রাচ্য প্রেম ভক্তি ও

প্রতীচ্য-কর্মশীলতা অপূর্বভাবে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেই তাঁহাকে অনেক পরিমাণে আমাদের আদর্শস্থানীয় করিয়াছে।’

“স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল’ নামক ক্ষুদ্র প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত চক্রবর্তী উক্ত মহাত্মা সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করিয়াছেন। উমেশচন্দ্র অধিক বয়সে বঙ্গসাহিত্যে প্রবেশ করিয়া অল্পকালের মধ্যেই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছেন। তাঁহার লেখা যেমন সরস, প্রাঞ্জল এবং পরিপক্ক ছিল তেমনি তাহার মধ্যে লেখকের স্বকীয়তা, নির্ভীকতা এবং অকৃত্রিম দৃঢ় ধারণা প্রকাশ পাইত। কেবল যে রচনাগুণে তিনি শ্রদ্ধেয় ছিলেন তাহা নহে; রজনীকান্তবাবু লিখিতেছেন, “ব্যবহারে তিনি কলঙ্কশূন্য ছিলেন। কোনোরূপ কুসংস্কার তাঁহার হৃদয় স্পর্শ করিতে পারিত না। পৌত্তলিকতার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। উপনিষৎপ্রোক্ত ব্রহ্মোপাসনাই প্রকৃত হিন্দুধর্ম এ কথা তাঁহার মুখে ব্যক্ত হইত। উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত শিক্ষার সহ উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি শিক্ষা মিলিত হইলে কী অমৃতময় ফল প্রসব করে, তাহা তাঁহার জীবনে পরিলক্ষিত হইত। তাঁহার কোনোরূপ আড়ম্বর ছিল না। তাঁহার রামনগর বাসাবাটিতে গিয়াছি, এক কম্বলাসনে বসিয়া নানা আলাপ করিয়াছি। যখনই গিয়াছি কিছু-না-কিছু শিখিয়া আসিয়াছি। নিয়ম পথ হইতে তিনি রেখামাত্র বিচ্যুত হইতেন না।’

সর্বশেষে, আমরা প্রদীপের উন্নতির সঙ্গে তাহার স্থায়িত্ব কামনা করি। প্রদীপ যেরূপ প্রচুর পরিমাণে তৈল পুড়াইতেছে তাহাতে আশঙ্কা হয় কোন্ দিন তাহার অকাল নির্বাণ হইবে। এত ছবি না ছাপাইয়া এবং এত খরচপত্র না করিয়াও কেবল প্রবন্ধগৌরবে প্রদীপ স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারিবে এইরূপ আমাদের বিশ্বাস।

ভারতী, অগ্রহায়ণ, ১৩০৫।